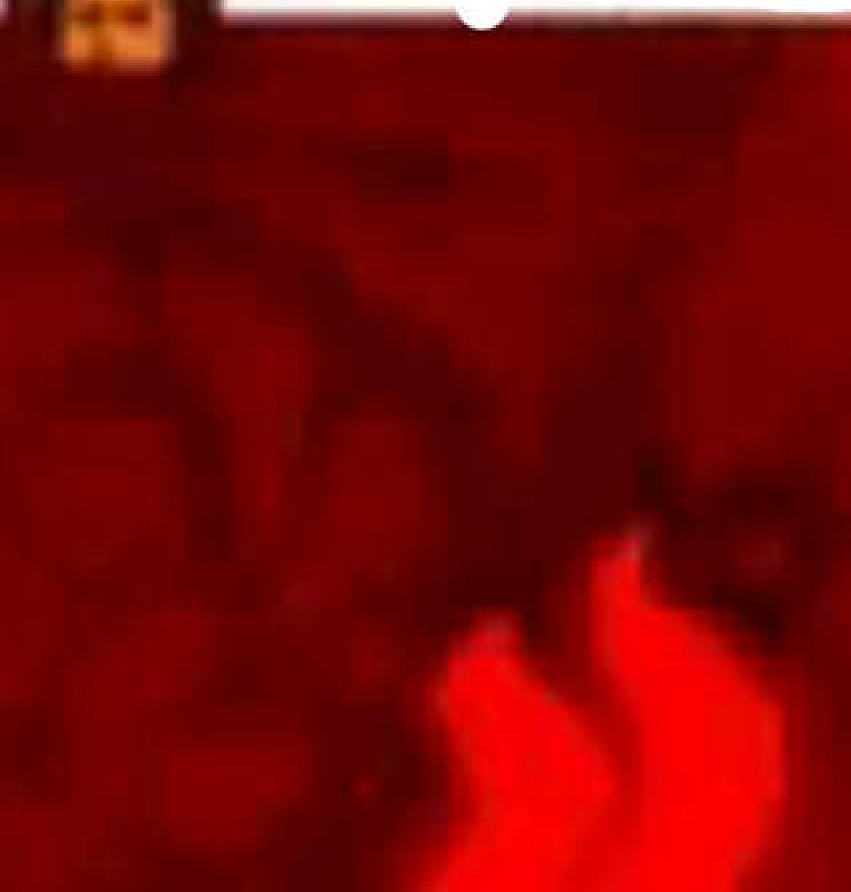
আহমদ ছফা

ওঙ্কার



ওঙ্কার

আহমেদ ছফা

এক

আমাদের কিছু জমিজমা ছিল। আমার বাবা নিজে করেননি। তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। সম্পত্তির সঙ্গে একখানা মেজাজও তাঁকে পূর্বপুরুষেরা দিয়ে গিয়েছিলেন। তাঁর তেজ বিশেষ ছিল না, তবে ঝাঁঝটা ছিল খুব কড়া রকমের।

সময়টা বাবার জন্য যথেষ্ট ভালো ছিল না। শহর বন্দর অফিস আদালত কলকারখানায় ব্যক্তির আত্মসত্তা লোপের সময় তখন। বাবা পূর্বপুরুষের গরিমায় নিজের শোণিত উষ্ণ রাখতে চেষ্টা করতেন। ঈষদুষ্ণ নয়, কিছুদিন রীতিমতো উষ্ণই রাখতে পেরেছিলেন। তার কারণ বাবা সে পিতৃপুরুষদের সঞ্চিত বিত্তে আত্মশোণিতের হিমোগ্লোবিন কণা উজ্জ্বল রাখতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি। কিন্তু, হায়রে ।কবে কেটে গেছে সে কালিদাসের কাল!

আমার বাবা যেভাবে দিনাতিপাত করতেন তাকে কিছুতেই একজন সুস্থ মানুষের স্বাভাবিক জীবন ধারণ বলা যাবে না। তাঁর স্বপ্ন কল্পনা চিন্তা বাসনার বাগানে পিতৃপুরুষদের প্রেতাত্মারা দলে দলে হানা দিতো। এই প্রেতাত্মারাই তাঁকে নেশাগ্রস্ত করতো। তিনি একজন নেশাগ্রস্ত মানুষের মতোই জীবন যাপন করতেন।

বলতে ভুলে গেছি। আচারে ব্যবহারে তিনি উগ্র রকমের পরহেজগার মানুষ ছিলেন। তাঁর বিশ্বেস সংস্কার নিয়ে ঠাট্টা করবো অন্তত তেমন কুসন্তান আমি নই। বাবা ধর্মপরায়ণ মানুষ ছিলেন। শরীয়তের নির্দেশ অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলতেন। চূড়ান্ত দুঃখের দিনেও আল্লাহর ওপর ভর করে নির্বিকার থাকতে পারতেন।

অতি ছোটো বয়সে তাঁকে হাতীর দাঁতে খোদাই করা ব্যক্তিত্বের অনুপম স্তম্ভ মনে করতাম। এখন বুদ্ধি বিবেচনা পেকেছে। দুনিয়াদারীর যাবতীয় বস্তু বিবসনা করে ভেতরের ব্যাপার জানার মতো দুঃসাহসী হয়ে উঠেছে চেতনা।

জনকের কাঠিন্যমণ্ডিত বয়েসী ছবিটি স্মরণে এলেই কেন বলতে পারবো না, শরীরের আঁকে বাঁকে ঢেউ খেলে একটা ধ্বনি চেতনার রন্ধ্রে রন্ধ্রে প্রাণময় হয়ে ওঠে। পশু-পবিত্র পশু। হ্যাঁ তিনি পবিত্র পশুই ছিলেন। আর তার পূর্ব পুরুষেরা ছিলেন যথার্থ পশু। এক সময়ে মদে মেয়ে মানুষে আমাদের সে তল্লাট উজাগর করে রেখেছিলেন। তার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি অতীত যুগের পরিধি পেরিয়ে আমার কানে বহু দূরাগত বাদ্যের আওয়াজের মতো রণিত হয়নি এমন নয়। ক্ষুধার্ত মানুষের কর্কশ আর্ত চীৎকার শুনেছি। অতীত রূপী মিউজিয়ামে সঞ্চিত চিত্রমালার আভা, ধ্বনিপুঞ্জের লাবণী, রক্তের খরতেজ আমাকে স্পর্শ করতে পারেনি।

এখন স্পষ্ট বুঝতে পারি এর সব কটিই বাবার চিন্তা চেতনার পরতে পরতে অপরূপ কুহক রচনা করেছিলো। বাবাকে তাই পবিত্র পশু বলেছি। আবার এই সময়ের মধ্যেই জগতের আমাদের অংশে নতুন ছাঁদের পশুদের উদ্ভব হতে শুরু করেছে।

কখনো কখনো ভারি বিব্রত লক্ষ্য করতাম তাঁকে। বার্ধক্য জীর্ণ মুখাবয়বে একটা অসহায় ভঙ্গি বড়ো করুণভাবে ঝুলে থাকতো। তখন বুঝিনি অল্প বয়সে বুদ্ধি ছিল না। এখন উপলব্ধির স্তরে জনকের অদৃশ্য অশ্রুপাত জোয়ারের জলের মতো ফুলে ফুলে সারা মনপ্রাণ ভিজিয়ে দিয়ে যায়।

অনেকবার বাবাকে আমাদের পিশাচের দাঁতের মতো ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লাল ইট বের হওয়া দালানের নামাজের বিছানায় বসে হতাশভঙ্গীতে রেলের লাইন, ট্রাক বাসের গতায়ত, এক চোখ কানা আবুনসর মোক্তার সাহেবের ধবধবে সাদা নতুন বাড়ীর পানে তাকিয়ে থাকতে দেখেছি। চিড়িয়াখানার খাঁচায় আবদ্ধ সিংহ যেমন সম্পূর্ণ অনাত্মীয় দৃষ্টিতে লোহার খাঁচা নিরিখ করে, তেমনি দৃষ্টি দিয়ে আমার বাবা আমার কালের পৃথিবীর দিকে তাকাতেন। গাছপালা দেখলে অন্তরীণ সিংহশিশুর চোখে যেমন গহন বন, নিবিড় অরণ্যানী আর

নিষ্ঠুরতার স্বপ্ন নামে, তেমনি আবেশে ঘনিয়ে আসতো দৃষ্টি, যখন তিনি ফার্সি হরফে লেখা তুলোট কাগজের ‘সজরা’ অথবা বংশপঞ্জীর বুকে সস্নেহে আঙ্গুল বুলাতেন। যুগ যুগান্তরের পুরনো কীটদষ্ট পাংশুটে তুলোট কাগজ। ডানদিক থেকে জের জবর সম্বলিত বাঁকা বাঁকা টানা হাতের লেখা খয়েরি রঙের হরফগুলো অখণ্ড প্রতাপ অফুরন্ত মহিমার প্রতীকের মতো তাঁর চোখে অদৃশ্য শিখায় জ্বলজ্বল করতো। নামোক্ত এসব মহাপুরুষদের স্মৃতিতে জীয়ন্ত করে বাবা তাঁদের সঙ্গে হৃদয়ের ভাব বিনিময় করতেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে থাকতেন একটানা। সেই সময় বাবার চারপাশে চেতনে নিশ্চেতনে মিশে একটা নিশ্চল তন্ময় পরিবেশের সৃষ্টি হতো। তন্ময়তা কেটে গেলে তাঁর দু চোখে একটা অচেনা আলো ফুটে বের হতো। তার অর্থ করলে এরকম দাঁড়াত—এই দুনিয়াদারী, ঘরবাড়ী, মানুষজন এসবের কিছুই আমি চিনিনে, কিছুই বুঝিনে। তাঁর দৃষ্টিতে বন্দী বিহঙ্গের কাতরতা ফুটে থাকতো। সামনে যে যুগ থাবা প্রসারিত করে এগিয়ে আসছিলো তার নখরাঘাত তিনি অনুভব করতেন। এই যুগে তিনি যে একজন ফালতুর বেশি নন তা নিজেই ভালো করে উপলব্ধি করতেন।

তাঁর চিন্তা কল্পনা সবই অতীতের মাপে তৈরী। কিছু বর্তমানের সঙ্গে খাপ খায় না। সে জন্যেই বোধ হয়, সৃষ্টিকর্তার ওপর তাঁর আস্থাটাও নোঙরের মতো অমন স্থির অনড় ছিল। সহায়হীন মাতাল রাতের অন্ধকারে ঘরের বৌয়ের গঞ্জনা সইতে না পেরে যেমন শুঁড়িখানায় সান্ত্বনার সন্ধানে যায়, তেমনি চার পাশের পরাক্রান্ত পৃথিবী প্রবল তিরস্কারে বাবাকে তাঁর চোখেমুখে কি রকম বিষণ্ণ যন্ত্রণার ফুল ফুটে থাকতো। তাঁর যন্ত্রণার মধ্যে সমস্ত বিশ্বেসী মানুষের যন্ত্রণা আমি প্রত্যক্ষ করেছি।

যেহেতু আমি বাবাকে পবিত্র পশু বলেছি সেজন্য কেউ যেন আমাকে পিতৃপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাহীন মনে না করেন। পশুদেরও তো রক্তধারা

বংশপরম্পরা সামনের দিকে ধাবিত হয়। আমি নিজে যে মমতাহীন নই তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ নিজের মুখে সে কাহিনী চূড়ান্ত বিশ্বস্ততা সহকারে আপনাদের কাছে বলে যাচ্ছি।

পুরনো মডেলের গাড়ী যেমন শহরের নতুন রাস্তায় ঠিকমতো চলতে পারে না, ঝঞ্ঝাট লাগায়, দুর্ঘটনা বাধায়, ধোঁয়া ছড়ায়, তেমনি আমার বাবা আমার কালের পৃথিবীতে বসবাসের যোগ্যতা হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি কেবল দুর্ঘটনার জন্ম দিয়েই যাচ্ছিলেন। সৃষ্টির বোঁটা ধরে নাড়া দিয়ে একটা লণ্ডভণ্ড কাণ্ড বাধাবার মতো শক্তি কিংবা শিক্ষা কোনোটিই তাঁর ছিল না। তিনি আঘাত করতে যেয়ে আহতই হচ্ছিলেন।

বলেছি, সামান্য কিছু জমি জিরেত তিনি তাঁর বাবার কাছ থেকে পেয়েছিলেন। তাই নিয়ে খোঁচাখুঁচি করে বিক্রম প্রকাশ করতেন। তাই করে রক্তের হিংস্রতার দংশন কিছুটা লাঘব করতেন। আমাদের মানুষজন বিশেষ ছিল না। খুনজখম বাধিয়ে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড ঘটানো তাও সাধ্যের বাইরে ছিল। বাবা মামলা মোকদ্দমা করেই মনের ঝাল মেটাতেন। তখন দুনিয়ায় আমাদের অংশ আবুনসর মোক্তার সাহেবদের দখলে চলে যেতে বসেছে।

দুই

পূর্বপুরুষের একটা তালুকের সাড়ে তিন আনা অংশের মালিক ছিলেন আমার বাবা। সে গর্বে তিনি সর্বক্ষণ স্ফীত হয়ে থাকতেন। কেউ টু শব্দটি করলে সহ্য করতে পারতেন না। গ্রামের মানুষ এইরকম একটি ফুটো তালুকদারের কর্তালি মেনে নেবে তারা তেমন বোকা ছিল না। সুতরাং তারা শব্দ করতো, হল্লা করতো, গান করতো এবং চিৎকার করতো। গ্রামবাসীর সম্মিলিত জীবনধারা থেকে খসে পড়া শব্দমালা আমার জনকের গায়ে বিছুটির জ্বালা ধরিয়ে দিতো। সে জ্বালা মিটাতে যখন তখন তিনি আদালতে ছুটতেন। বেছে বেছে ফৌজদারি মামলা রুজু করতেন। একধারা দু'ধারা থেকে আরম্ভ করে ক্রিমিনাল এ্যাক্টের সাতশো সাতাশি ধারা পর্যন্ত গরিব প্রতিবেশীর নামে ঠুকে দিতেন।

এ ব্যাপারে আবুনসর মোক্তার সাহেব ছিলেন বাবার ডান বাম দুই হাত এবং সে সঙ্গে শলা-পরামর্শ বুদ্ধি-বিবেচনার একখানি নির্ভরযোগ্য আড়ত। একেকটি মোকদ্দমার দিন এলে আমাদের বাড়িতে উৎসবের ধূম লেগে যেতো। সাক্ষীরা লুঙ্গির গিঁট খুলে দিয়ে চিবিয়ে চুষে খেতো। বাটাভরা পান থেকে কিছু মুখে পুরতো এবং কিছু লুঙ্গির গিঁটে গুঁজতো। তারপর সাড়ে সাত টাকা নগদ গুণে ভোর সাড়ে আটটায় ট্রেনে আল্লাহর নামে হলপ করে মিথ্যে সাক্ষ্য দিতে আদালতে ছুটতো। মোকদ্দমা কোর্টে ওঠার আগে বাবা সাক্ষিসাবুদ সহ আবদুল ফাত্তাহ লেনে মোক্তার সাহেবের বাসায় এসে হাজির হতেন। মোক্তার সাহেব সাক্ষীদের মিথ্যে কথার প্যাঁচগুলো একটু একটু কষে দিতেন।

আমাদের বাড়িতে পাঁচ সাত জন মোল্লা সারাক্ষণ মুখে ফেনা ছুটিয়ে কোরআন পাঠ করতো। মা সারাদিন রোজা রেখে আসমানের আল্লাহর মন জোগাতে চেষ্টা করতো। মোকদ্দমার দিন এলে ভারি খুশী হয়ে উঠতাম আমরা সব কটি ভাইবোন। মানুষজনের নিষ্প্রাণ স্তব্ধতায় ক্ষণস্থায়ী হলেও একটা

চাঞ্চল্য জেগে উঠতো। তা আমাদের বুকের গভীরে আনন্দের ঘূর্ণিস্রোত বইয়ে দিতো। মোকদ্দমার দিন যাতে ঘন ঘন আসে সে জন্য শিশুমনের সবটুকু আবেগ ঢেলে খোদার কাছে আবেদন পাঠাতাম। তাড়াতাড়ি মোকদ্দমার দিন এলে বাবা ভীষণ নেতিয়ে পড়তেন। তিনি অনেক সময় নামাজের বিছানায় ঘুমিয়ে যেতেন। মুখের রেখাগুলো আরো গভীর দেখাতো। এ সময় মাকে বড়ো কাতর দেখতাম।

সেবার একটা ব্যাপার ঘটে গেলো। বাবা তাঁর প্রতিভার জোরে একটা আধা খুনের মামলায় জড়িয়ে গিয়েছিলেন। বাস্তবে কিন্তু লোকটিকে খুন করার সঙ্গে তাঁর কোনো সংযোগ ছিল না। তবে তিনি দীর্ঘদিন থেকে প্রকাশ্যে বলে বেড়াচ্ছিলেন, ওই হারামজাদা পাজিটাকে বাগে পেলে খুন না করে ছাড়বেন না। বলাবাহুল্য, কারো সঙ্গে ঝগড়া বচসা ইত্যাদি হলে তিনি খুন করার সঙ্কল্প সারস্বরে ঘোষণা করতে পারলেই খুব প্রীত হতেন। শেষ পর্যন্ত সে ঘোষিত মানুষটাই মঙ্গলবার হাট থেকে ফেরার পথে ভয়ঙ্করভাবে জখম হলো।

গাঁয়ের লোকদের কেউ বাবার নামে অপবাদ দিলো, আবার কেউ তার প্রথম পক্ষের বড় ছেলেকে দুষলো। ঐ ছেলেটার সঙ্গে তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীর একটা বিশ্রী ব্যাপার নিয়ে বেশ ঘাটাঘাটি হচ্ছিলো। সে যাক। লোকটা কিন্তু বাবাকে এক নম্বর আসামি করে মামলা লটকে দিলো। সে ছিল গাঁয়ের খুব জবরদস্ত মানুষ। তার বিরুদ্ধে আমাদের পক্ষে কেউ সাক্ষ্য দেবে তা ছিল কল্পনার অতীত। মোক্তার সাহেব বাবাকে একজন প্রখ্যাত মিথ্যে বিশারদ সাক্ষী জুটিয়ে দিয়েছিলেন। শুধু এই মহাপুরুষের সাক্ষ্য দেয়ার গুণে কতো খুনের আসামী বেকসুর খালাস গেছে, কতো তালুকদারি জমিদারি লাটে উঠেছে, কতো সম্পন্ন গেরস্তের বাস্তুতে ঘুঘু চরেছে-রঙ চড়িয়ে বর্ণনা করেছিলেন। বাবা এই ফলাও বর্ণনা শুনে খুবই আশ্বস্ত হয়েছিলেন। সঙ্গে সঙ্গেই সাক্ষীকে দেবার জন্য মোক্তার সাহেবের হাতে নগদ একশো টাকা প্রদান করেছিলেন। সেও

নিতান্ত কাঁচুমাচু হয়ে তাঁর ভাবখানা এরকম ছিল যে এই মহান মিথ্যের শিল্পীর প্রকৃত সমাদর করার ক্ষমতা আপাততঃ তাঁর নেই। সেই সময়ে আমাদের সংসারে টাকা পয়সার খুবই টানাটানি। জমি বন্ধক রেখেও কোথাও টাকা সংগ্রহ করার উপায় ছিল না। কারণ বন্ধকীযোগ্য জমিগুলো বহু আগেই মহাজনদের দখলে গিয়েছিলো।

অবশেষে একদিন আমরা মিথ্যে বলার বীরপুরুষটিকে দেখতে পেলাম। কালো কুচকুচে বেঁটে চেহারার গুছি দাড়িঅলা আস্তে আস্তে কথা বলে মানুষটিকে ভীতি মিশ্রিত কৌতূহল সহকারে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখেছি। যতোক্ষণ এই রহস্যময় মানুষটি আমাদের বাড়িতে ছিল, আমি একবারও অন্যদিকে দৃষ্টি ফেরাইনি। ভাবে ভঙ্গিতে আমাদের মনে হয়েছিলো মস্তবড়ো একজন বীর পুরুষ বাক্যের মন্ত্রশক্তিতে পৃথিবীর যাবতীয় নয়কে ছয় এবং ছয়কে নয় করার ক্ষমতা তিনি রাখেন বটে।

আদালতে হাকিমের সামনে হাজির হওয়ার পরেই লোকটা তার আসল প্রতিভার পরিচয় দিলো। প্রতিপক্ষের কাছ থেকে আরো কিছু বাড়তি টাকা কোমরের খুঁতিতে গুঁজে আদালত গৃহে শপথ করে বলল যে সে নিজের কানে বাবাকে বলতে শুনেছে যে আহাদ আলিকে খুন না করে তিনি ছাড়বেন না এবং আহাদ আলী যে আল্লাহর অপরিসীম অনুগ্রহে প্রাণে বাঁচতে পেরেছে, সেজন্য হাকিমের সামনেই আল্লাহকে ধন্যবাদ জানালো! এমন পাকা সাক্ষীর কথা অবিশ্বেস কোন হাকিম করতে পারে? মামলায় আমাদের হার হলো। বাবা একটুর জন্য জেল থেকে বাঁচলেন। লোকজনকে বলাবলি করতে শুনলাম মাথার শুভ্রকেশের দিকে তাকিয়ে আদালতের হাকিম বাবার ওপর করুণা করেছেন। আমাদের নগদ আড়াই হাজার টাকা জরিমানা দিতে হলো। সারা বছরের খোরাকির জন্য আমাদের যে জমিগুলোর ওপর নির্ভর করতে হতো, তার একাংশ জলের দামে বেচে আদালতের প্রাপ্য শোধ করতে হলো।

সময় বয়ে যাচ্ছিলো। এরই ফাঁকে ফাঁকে বোনেরা সেয়ানা হয়ে উঠলো। বিয়ে হয়ে গেলো সকলের ঝটপট করে। এ ব্যাপারে বাবার ধর্মপ্রীতি খুবই সাহায্য করলো। তিনি মনে করতেন যুবতী মেয়ে ঘরে পুষে রাখাটা মস্ত গুনাহর কাজ। তাই বোনেরা একটু সেয়ানা হয়ে উঠতে না উঠতেই হাতের কাছে যাকে পেলেন কোন রকম বাছবিচার না করে ধরে ধরে গছিয়ে দিলেন।

বাকি রয়ে গেলাম আমি। সবে বি এ ক্লাসে ভর্তি হয়েছি। আমার পড়াশুনা সংক্রান্ত কোনো ব্যাপারে বাবাকে কোনো দিন উচ্চবাচ্য করতে শুনিনি। তিনি কিন্তু মনে মনে এই স্কুলে কলেজে পড়াশোনার কাজটাকে পছন্দ করতেন না। তবে মুখ জবরদস্তি করতে সাহস করতেন না। কতেক বিষয়ে মায়ের ওপর জবরদস্তি করতে সাহস করতেন না। আমার পড়াশোনা তার একটি।

আমার মায়ের অতো ঠাট ঠমক ছিল না। মা সাদাসিধে গেরোস্ত ঘরের ময়ে। কোনোদিন তাকে কারো বিরুদ্ধে নালিশ করতে শুনিনি। অপ্রাপনীয় বস্তুর প্রতি লোভ কিংবা আগ্রহ মা জীবনে দেখায়নি। মায়ের উৎসাহ, আগ্রহ এবং চোখের জলই আমার তাবৎ কর্ম-প্রেরণার উৎস।

আমার বাবাও যে এক সময়ে প্রকৃত পশু হতে চেষ্টা করেছিলেন তার প্রমাণ আমার এই মা। বাবা যৌবনকালে এক গেরস্ত ঘরের মেয়েকে রূপ দেখে জোর করে বের করে নিয়ে এসেছিলেন। মোল্লা মৌলবি ডেকে যে বিয়ে পড়ানোর একটা ব্যাপার আছে তাও প্রথমে করেননি। পরে চাপে পড়ে কিছু কিছু সামাজিকতা পালন করতে হয়েছিলো। বাবাকে বাঁকা লাঠি হাতে মসজিদ থেকে বেরুতে দেখলে পাড়ার বর্ষীয়সী নারীরা স্মৃতির ভাণ্ড নাড়া দিয়ে সেসব কথা যখন বলাবলি করতো লজ্জা শরমে আমার দু'কান লাল হয়ে যেতো।

আড়াই হাজার টাকা জরিমানা দিয়ে বাবার মাথা ভয়ঙ্কর রকম বিগড়ে গিয়েছিলো। গ্রামে আমাদের খুবই অখ্যাতি রটেছিল। বাবা দশজনের সামনে

মুখ দেখাতে পারছিলেন না। হাটে বাজারে যাওয়া-আসা করাও তাঁর পক্ষে একরকম অসম্ভব হয়ে পড়েছিলো। তিনি আমাদের দহলিজে বসে দিনরাত চাপা রাগে ফুলতে লাগলেন। অপমানে হতাশায় অন্ধ হয়ে এককালীন হিতৈষী সুহৃদ আবুনসর মোক্তার সাহেবের সঙ্গে এক ধারা দু'ধারা থেকে শুরু করে আইনের সর্বোচ্চ নম্বরের মামলা জুড়ে দিলেন।

আবুনসর মোক্তার সাহেব এবং তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গো যে জটিল প্যাঁচ কষে দুনিয়ার আমাদের অংশ নিজেদের অধিকারে নিয়ে আসছিলেন, সে একই সূক্ষ্ম প্যাঁচ অতীতজীবী উদভ্রান্ত বাসনার অসহায় শিকার আমার বাবার ওপর ঠাণ্ডা মাথায় অথচ পরম নিষ্ঠুরতার সঙ্গে প্রয়োগ করে রক্তের গাঁজলা বের করে দিচ্ছিলেন। মামলায় আমাদের হার হচ্ছিল। বাবা যতোই হারছিলেন ততোই ক্ষিপ্ত হয়ে উঠছিলেন। এক সময়ে অবশ্য তার বুঝতে বাকি রইলো না, কানা মোক্তার তাঁকে সম্পূর্ণ ধরাশায়ী না করে ছাড়বেন না।

তিন

সেই সময়ে যুক্তফ্রন্ট সরকার পূর্ব পাকিস্তানের ক্ষমতায় আসে। তারা জমিদারি প্রথা উঠিয়ে দিলো এবং জমিদারির পেছন পেছন তালুকদারি প্রথা আপনা থেকেই উঠে গেলো। বাবা খবরটা কাগজে পড়ে প্রথম দু'তিন দিন—যে ভিখিরির ছেলেরা ক্ষমতা হাতে পেয়ে পুরনো মানী লোকদের বেইজ্জত করতে লেগেছে, তাদের উদ্দেশে সুশ্রাব্য নয় এমন শব্দরাজি একটানা বর্ষণ করে গেলেন।

তারপরে একেবারে অন্য মানুষ বনে গেলেন। বসলে উঠবার কথা ভুলে যেতেন। ভাতের থালা নিয়ে ঠায় বসে থাকতেন। গ্রাস মুখে তুলতে যেয়ে কি ভেবে শিউরে উঠতেন, হাতের গ্রাস মাটিতে পড়ে যেতো। অথচ কিছুদিন আগেও তিনি মোক্তার সাহেবের সঙ্গে কি প্রচণ্ড বিক্রমে লড়েছিলেন। তাঁর প্রাণশক্তি কি করে এমন থিতিয়ে এলো বুঝতে পারলাম না।

তালুকদারি গেছে আমাদের কাছে সুসংবাদ বৈ এমন কিছু নয়। কিন্তু বাবার বুকে আঘাতটা বজ্রশেলের মতো বাজলো। একটা শরিকি তালুকের সাড়ে তিন আনা অংশের মালিক ছিলেন আমার বাবা। বছরে একশো তিন টাকা বারো আনা সাত পাই খাজনা আমাদের পাওনার কথা। কিন্তু আমার বয়েসকালে কোনোদিন টাকাটা বিনা ঝঞ্ঝাটে পেয়েছি একটুও মনে পড়ে না। বরঞ্চ কোনো কোনো বছর আদালতে তার দশগুণ ব্যয় করতে হয়েছে।

বাবার একটা প্রাণপ্রিয় স্বভাব—যাদের কাছে তিনি খাজনা পেতেন, তাদের উঠতে বসতে ছোটলোক ছাড়া ডাকতেন না। আর সেই ছোটলোকেরাই লেখাপড়া বিত্ত বৈভবে আমাদের চাইতে অনেক বেশি সম্পন্ন ছিল। নতুন কোন মানুষের সঙ্গে পরিচয় হলেই হাতের বাঁকা লাঠিটি প্রসারিত করে গোটা গ্রামখানি দেখিয়ে বলতেন, এই যে দেখছেন চার পাশের ঘরবাড়ী এরা সবাই আমাদের সাতপুরুষের প্রজা। সাত পুরুষের প্রজারাও তাই আদালতে

তালুকদার সাহেবকে না তুলে খাজনাটা কখনো হাতে হাতে পরিশোধ করতো না। বাবাকে আদালতে নালিশ করতে হতো, ওরা পাল্টা জবাব দিতো। এভাবে উকিল মোক্তার সাক্ষী সাবুদ পেশকার পেয়াদার পেছনে নির্ঘাত হাজারখানেক টাকা বেরিয়ে যেতো। সেই তালুকদারি যাওয়াতে একটু ব্যথা পেলেও মনে মনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম। যাক মামলা মোকদ্দমার হ্যাঙ্গামা হুজ্জুত পোহাতে হবে না।

বাবার শরীর দিনে দিনে ভয়ঙ্কর রকম দুর্বল হয়ে আসছিলো। তিনি ক্লোরোফর্ম করা রুগীর মতো অসাড় হয়ে পড়ে থাকতেন। যখন তখন সে তুলোট কাগজের বংশপঞ্জীটা খুলে বসতেন। খয়েরী হয়ে আসা হরফগুলোর দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকতেন। বংশপঞ্জীটি আমাদের পরিবারের উত্তরণ ধারার রেখাচিত্র। কালের জল আমাদের মেদ মাংস পচিয়ে ফেলেছে একথা সত্যি, তবু কিন্তু অস্থির আড়ালে মজ্জার সঙ্গে শয়ান এক রকমের হীরকের মতো কঠিন অথচ জ্যোতিষ্মান অহংকার আমরা লালন করতাম। যতোই দরিদ্র হই, সেই শিলা-দৃঢ় অহংকার ভাইবোন কেউ ভুলতে পারিনি।

এই বাঙালি মুলুকে আমাদের স্থিতি হয়েছিলো সেই কবে মোগল আমলে। মোগল আমল, নবাবী আমল, ইংরেজ আমল কতো কাল এলোগেলো। কতো রাজ্য কতো রাজা এসেছে আর গিয়েছে। কতো যুদ্ধ বিগ্রহ, ধ্বংস-সৃষ্টি, বিপ্লব-উপবিপ্লব সবকিছুর আঘাত সহ্য করেও সগৌরবে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিলো আমাদের পরিবার। কোনো আকস্মিক বিপদ-আপদই আমাদের পরিবারকে স্পর্শ করতে পারেনি। অখণ্ড প্রতাপ খণ্ড খণ্ড হয়ে পড়েছে, বিশাল জমিদারী কোথায় বিলীন হয়েছে। তারপরও এক পুরুষের পর এক পুরুষ এসেছে। হৃদয় লালিত অহংকারে ভরিয়ে দিয়ে গেছে উত্তর পুরুষের বুক। বংশপঞ্জীতে তাদের আশ্চর্য সব নাম পাঠ করে আর ততোধিক আশ্চর্য কীর্তি

কাহিনী শ্রবণ করে আমি নিজেও তো কতোবার রোমাঞ্চিত হয়ে উঠেছি। এই সম্মোহনের মধুর স্বাদ কি করে কাটাই।

বাবার অবস্থা ভয়াবহ। এই তালুকদার শব্দটার ব্যঞ্জনায় তিনি সর্বক্ষণ মোহিত হয়ে থাকতেন। ভুলে যেতে পারতেন চার পাশের বাস্তবের রূঢ় পরিবেশ। এই পাঁচটি অক্ষরে উচ্চারিত বিশেষ ধ্বনিটির মাধ্যমে তিনি পূর্বপুরুষের নৈকট্য অনুভব করতেন। সেই তালুকদার নামটাই আইনের খড়ো কাটা পড়ে গেলো। তিনি অনুভব করলেন, বংশপঞ্জীতে তাঁর নাম থাকার আর কোন সার্থকতা নেই। চোখ কান খুঁচিয়ে উপলব্ধি করলেন ঘুমের ভেতর স্বপ্নের যোগানদার, জাগরণে নেশাগ্রস্ত করার মহাজনদের হাট থেকে তিনি একেবারে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়লেন। বৈরী বিশ্বে দাঁড়িয়ে অস্তিত্বের অর্থহীনতা গভীর মর্ম বেদনায় প্রথমবারের মতো অনুভব করলেন, অচেতন রোগী সংজ্ঞা ফিরে পাওয়ার পর একটা হাত কিংবা পা কাটা দেখে যে রকম রিক্ততা অনুভব করে তেমনি এক ধরনের রিক্ততার ভেতর ডুবে গেলেন বাবা। তাঁকে বাতে ধর জখম করে দিয়ে গেলো। তিনি উত্থান শক্তি হারালেন।

আমার বি.এ পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে। এমন সময়ে চূড়ান্ত দুঃসংবাদ শুনলাম। বাবা হাইকোর্টের মামলায় গরু হারা হেরেছেন। আবুনসর মোক্তার সাহেব মামলার খরচ ডিক্রি পেয়েছেন। যেহেতু আমাদের ঋণ পরিশোধ করার মতো টাকা নেই, তাই, মোক্তার সাহেব আদালতে জীর্ণ বাড়ী, হাজা পুকুর, জমা দীঘি সব নিজের নামে নিলাম করিয়ে নিয়েছেন। খবর শুনে মাথা ঝিম ঝিম করতে লাগলো। পাগলের মতো ছুটে বাড়ী এলাম। গাঁয়ের মানুষ নানা রকমের গুজব ছড়াচ্ছিলো। কেউ বলছিল পুলিশ এনে আমাদের বাড়ী থেকে বের করে দেয়া হবে, কেউ বলছিল আমাদের জীর্ণ বাড়ী ভেঙ্গে বেগুন চাষ করে মোক্তার সাহেব গায়ের ঝাল মেটাবেন। আমি, আমি কি করবো! অসুস্থ জনক, বৃদ্ধা জননী এবং ছোট বোনটার হাত ধরে কোথায় যেয়ে দাঁড়াব! চিন্তা ভাবনা করার

শক্তি বিলকুল হারিয়ে ফেলেছিলাম। প্রতিবেশীদের কেউ কেউ সমবেদনার কথা বলতে আসতো। তখন, ঠিক তখনই আমার চোখ ফেটে ঝরঝর করে জল বেরিয়ে আসতে চাইতো।

এ অকূলেও কূল পেয়ে গেলাম। পথ বাৎলে দিলেন স্বয়ং আবুনসর মোক্তার সাহেব। বাবার এই সাংঘাতিক অসুখের সময় তিনি এক সন্ধ্যেবেলা আমাদের বাড়ীতে এলেন। আগের দিনে এলে যেমন করতেন, তেমনি অত্যন্ত প্রসন্নভঙ্গীতে কথাবার্তা কইলেন। আগে কেননা তাকে খবর দেওয়া হয়নি সেজন্য মৃদু স্বরে আমাদের বকলেন। বাবার কপালে হাত দিয়ে তাপ পরীক্ষা করলেন। চুক চুক আফসোস করলেন। কথাবার্তার ভঙ্গীটি এরকম যেন কোনো দিন তাঁর সঙ্গে আমাদের টু শব্দটি হয়নি। মনে হলো, মার সঙ্গে তিনি আগের চাইতেও সমীহ করে কথাবার্তা বলছেন। তাঁর আগমন আমাদের বাড়ীতে এতোই অভাবিত যে আমরা পান তামাকটা দেয়ার কথাও ভুলে গেছি। এরই মধ্যে অর্থস্বার্থ বুদ্ধি পরামর্শের জোরে মোক্তার সাহেব একজন দেশের কেউকেটা হয়ে উঠেছিলেন। তিনি যে এমনভাবে আমাদের বাড়ীতে আসতে পারেন, স্বপ্নেও ভাবতে পারিনি। অনেকক্ষণ বসে নানা সুখদুঃখের কথা কইলেন।

যাওয়ার সময় মাকে উঠোনে ডেকে নিলেন। নারকেল গাছের হেলানো ছায়াটির নীচে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ চুপি চুপি কি সব কথাবার্তা কইলেন। তারপর গমিত হলেন। সন্ধ্যেটা গাঢ় হয়ে এসেছে। আমাদের জীর্ণ বাড়ীতে ঝিঁঝিঁর চীৎকার ঘনায়মান অন্ধকারকে আরো ভূতুড়ে করে তুলেছে। মা ঘরে এসে অনেকক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলো। মোক্তার সাহেব তাকে ডেকে নিয়ে চুপি চুপি কি বলে গেলেন আমি জানতে চাইলাম। মা তেমনি চুপ করেই রইলো। ফের জিজ্ঞেস করলাম, কি বলে গেলে? মা দু'বার ঢোক গিললো। একবার আমার দিকে, একবার রুগ্ন বাবার দিকে বড়ো করুণভাবে তাকালো।

বুঝতে অসুবিধে হলো না, কথাটা বলতে মার কেমন জানি কষ্ট হচ্ছে। যাহোক কাঁথাটা বাবার গায়ের ওপর ভালো করে টেনে দিয়ে আস্তে আস্তে মা বললোঃ আমাদের বাড়ী ছেড়ে কোথাও যেতে হবে না, পুকুর দীঘি সব আগের মতো আমাদের দখলে থাকবে। মোক্তার সাহেব নিজ ব্যয়েই বাড়িঘরের সংস্কার করে দেবেন। বাবাকে শহরে রেখে বিলেত ফেরত ডাক্তার দিয়ে চিকিৎসা করবেন। এটুকু বলে একটু থেমে মা বাবার মুখমণ্ডল আরেকবার ভালো করে দেখে নিলো। আসল কথাটা বলবে কিনা তখনও দ্বিধা করছিলো।

কাঁথাটা বাবা শীর্ণ হাতে মুখ থেকে সরিয়ে ক্ষীণ কিন্তু তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন : তারপর ... তারপর কি বললো? এইবার মা বলে ফেললো। বিনিময়ে আমাকে শুধু তার বোবা মেয়েটিকে বিয়ে করতে হবে। বাবা একটিমাত্র ধ্বনি উচ্চারণ করলেন : কি? কেরোসিনের বাতিতে ঐ স্বল্পালোকিত ঘরে ঐ ছোট্ট ধ্বনিটি অনেকক্ষণ পর্যন্ত যেন হতে থাকলো। মা আর আমি পাশাপাশি বসে। বাবার মুখ দিয়ে সেই ছুঁচুঁলো ধ্বনিটি আবার তীরের মতো বেরিয়ে এলো—কি? তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করে পাশ ফিরে ঘুমালেন। তাঁর বুকের গভীরে ফোসকা পড়ছে আর ভাঙছে।

মা কোনো বিষয়ে কোনোদিন মতামত দেয়নি। বাবা নিঃসাড়। সব জেনে সব বুঝেও হাঁ বললাম আমি। কেন রাজী হয়ে গেলাম বলতে পারবো না। লোভের বশীভূত করার নিজস্ব একটা ক্ষমতা আছে। অতএব শ্রাবণ মাসের এক গুমোট দিনে আবুনসর মোক্তার সাহেবের বোবা মেয়েটির সঙ্গে আমার বিয়ে হয়ে গেলো। বাবার অবস্থা দিনে দিনে খারাপ হয়ে আসছিলো। মা কেমন ঝিম মেরে গেলো। মোক্তার সাহেব কথামতো বাবাকে হাসপাতালে রাখলেন। বড়ো ডাক্তার দেখালেন। ডাক্তার দেখলেন এবং ঘাড় ফেরালেন। তিনি হাসপাতালেই মারা গেলেন। বাবার পেছনে পেছনে গেলেন মা।

চার

আবুনসর মোক্তার সাহেব আমাকে শুধু মেয়ে দিলেন না। হতাশা লাঞ্ছিত পূর্বপুরুষের জীর্ণ অট্টালিকা থেকে টেনে আলো ঝলমল করা শহরে এনে বসালেন। রাজধানী শহর আমার চাকুরী হলো। চাকুরীর সঙ্গে সঙ্গে আস্ত একখানা বাড়ীও শ্বশুর সাহেব মোক্তারি বুদ্ধি খরচ করে জুটিয়ে দিলেন। আগে থাকতো এক নিরীহ ব্রাহ্মণ। যে প্যাঁচে শ্বশুর সাহেব তাঁর বেয়াইকে অন্ততঃ দশ বছর আগে স্বর্গে পাঠিয়েছিলেন একই প্যাঁচে নিরীহ ব্রাহ্মণকে গ্রাম এবং শহরের সমস্ত মূল থেকে উপড়ে তুলে সীমান্তের ওধারে ছুঁড়ে দিয়েছিলেন। মোক্তার সাহেবকে এখন থেকে শ্বশুরই বলবো। শুরু থেকে কেনে সম্মানসূচক বাক্য ব্যবহার করে আসছি, আশা করি এখন তা বুঝতে পারছেন।

দেশে ত্বরিত গতিতে সময় পালটাচ্ছিল। পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখের খবর সংবাদপত্রের পাতায় কালো ফুলের মতো ফুটে থাকে। দেশে আইয়ুব খান সাহেব সৈন্য সামন্ত নিয়ে গেড়ে বসেছেন। সংবাদপত্রের ব্যানারে খান সাহেবের একজোড়া গোঁফ হুংকার দিয়ে জেগে থাকে। দেখতে না দেখতেই দেশের জীবন প্রবাহের মধ্যে খান সাহেবদের অপ্রতিহত প্রভাব প্রবল সামুদ্রিক তিমির মতো ছুটাছুটি করছিলো। এই সুযোগে আমার শ্বশুরের মতো মানুষেরা অন্ধকার থেকে সূর্যালোক ফাঁকি দিয়ে শহরে ফ্ল্যাশ ক্যামেরার সামনে উঠে আসতে লেগেছেন। আগেই তিনি মোক্তারি ছেড়ে দিয়েছিলেন। মরা গরুর খালের নাহান আদালতের ময়লা বেঢপ শামলা গা থেকে গাছের পুরনো বাকলের মতো ঝরে পড়েছে কবে। এখন তিনি আদ্দির গিলেকরা ফিনফিনে পাঞ্জাবী পড়েন। সোনা বোতাম ঝিলিক দেয়। হাতে হীরার আংটি ঝকমক করে। তিনি আইয়ুব রাজত্বের একটা খুঁটি না হলেও ঠেকনা জাতীয় কিছু একটা তো বটেই। বসনে-ভূষণে সম্ভ্রান্ত হয়ে উঠেছেন। একটা ব্যক্তিত্বও না

জানি কোত্থেকে উড়ে এসে শরীরে আশ্রয় করেছে। একটু বয়স হলে যেমন মেয়েদের বুকে স্তনের বাঁকা রেখা আভাসিত হয়, তেমন টাকা পয়সা এবং দাপট এলেই শেয়ালের মতো চেহারায়ও সিংহের আকৃতি জাগি জাগি করে।

আমার শ্বশুরের চারদিকে জয়জয়কার। শালা-সম্বন্ধীরা ব্যবসায়ে রীতিমতো লাল হয়ে যেতে থাকলো। লোকে বলাবলি করতো আমার শ্বশুর ভাগ্যবান। নিজেকেও আমি কম ভাগ্যবান মনে করতাম না। এমন একজন লোকের মেয়ে বিয়ে করেছি, সেকি চাট্টিখানি কথা! নাইবা রইল একখানা হাত কিংবা পা। শ্বশুরের সৌভাগ্যের ছিটেফোঁটা আমিও পেতে থাকলাম।

ব্রাহ্মণের ভাঙ্গা বাড়িটা নতুন করে বানিয়েছি। ঝোপে ঝাঁপে ঢাকা কম্পাউণ্ডে একটা কুয়োর মতো ছিল। চারপাড় সিমেন্ট দিয়ে বাঁধিয়ে দিয়েছি। পুরানো ঘাট ঝালাই করেছি। আমাকে লোকে যাই বলুক শ্বশুরের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। তিনি আমার প্রকৃতি ধরতে পেরেছিলেন, তাই আমার জন্য যা যা করেছিলেন এমনভাবে করেছিলেন যেন প্রবৃত্তি এবং প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে খাপ খেয়ে যায়। কোনো কোনো গাছ আছে কড়া আলোতে বাঁচে না, কোন কোন মানুষ আছে ভিড় এবং ঠেলাঠেলি সইতে পারে না। সেদিকে লক্ষ্য রেখে শ্বশুর সাহেব আমার চাকুরী ঠিক করেছেন, বাসা নির্বাচন করেছেন আর যা যা করেছেন গায়ের লাগসই পোশাকের মতো একেবারে নিখুঁতভাবে মানিয়ে গেছে।

এসব ব্যবস্থাপনার মধ্যে একখানা শিল্পী মনের দরদ খুঁজে পাই। এসব তিনি করেছেন বোবা মেয়েটির জন্যই তো। মেয়েকে তিনি ভারী ভালবাসতেন। তাঁর আরো মেয়ে আছে। কিন্তু আমার স্ত্রীর প্রতি পক্ষপাতটা কম্পাসের মতো হেলে থাকতো। যখন আমার স্ত্রীর সাথে কথা বলতেন, মুখে কথা বলতেন না, আরেকজন বোবার মতো আভাসে ইঙ্গিতে কথা বলতেন। আসল বোবা আর নকল বোবার এই যে মাখামাখি তা আমার চোখে অত্যন্ত সুন্দর এবং পবিত্র

মনে হতো। এই জন্য আমার শ্বশুরকে আমি ভালবাসি। কেননা তাঁর একখানা দরদী মন ছিল। তিনি আপনার জনদের ভালোবাসতে জানতেন।

কিন্তু মানুষ তাকে ভালো বলতো না। তাঁকে দিয়ে যাদের সর্বনাশ হয়েছে তারা তাঁকে অভিসম্পাত দিতো। আমাকেও লোক মন্দ বলতো। কারণ আমি তাঁর বোবা মেয়ে বিয়ে করে অল্পস্বল্প সৌভাগ্যের মুখ দেখেছি। তার জন্য আমি কিছুই মনে করিনে। লোকে তো কতো কথাই বলে। তাছাড়া আমি নির্বিরোধ মানুষ। ঝগড়াঝাঁটি পরনিন্দে এড়িয়ে চলাই স্বভাব।

বাড়ীতে খাইদাই এবং ঘুমোই। নিয়মিত অফিসে যাই অফিস থেকে আসি। দিন কেটে যাচ্ছে একরকম দিনের মতো। আনন্দ নেই-নিরানন্দ তাও নেই। বন্ধুরা সকলে তাদের বৌয়ের গল্প করে। তাদের নিয়ে বাজারে যায়, সিনেমা দেখে অবসর মুহূর্তগুলো মৌচাকের মধুর মতো কথাবার্তার রসে ভরিয়ে রাখে। কোনো কোনো বন্ধুর বাড়ীতে যেয়ে তাদের বৌদের সঙ্গে গল্প করেছি, গান শুনেছি। মনের মধ্যে একটা কাঁটার তীক্ষ্ণ দংশন অনুভব করেছি। আমার বুকের ভেতরে একটা দুঃখ পাশ ফিরে ঘুমিয়েছে। জীবনে কি সব পাওয়া যায়! সকলে কি সমান ভাগ্যবান! মনকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করতাম। কখনো প্রবোধ মানত কখনো মানত না। বাতাসের মতো চঞ্চল মন!

আমাদের অফিসে নৃপেন নামে এক এল-ডি ক্লার্ক আছে। সে আমার পাশের কামরায় বসে। ফাঁকিবাজ ছোকড়া। প্রতি দিন আড্ডা ইয়ার্কি করে দশটা থেকে পাঁচটা কাবার করে। কাজ পড়ে থাকে। চাকুরী যাই যাই করেও কি কারণে জানি যায়নি।

কিছুদিন আগে সে ছোঁড়ার বিয়ে হয়েছে। বিয়ের পর থেকে নৃপেন এক নতুন উৎপাত শুরু করেছে। নতুন বৌ কি বললো, কিভাবে বললো—একটা কথা একশোবার করে বলতো। হেসে কথা বললে কি রকম দেখায়, রেগে বললে কি রকম মুখের ডৌল হয়, স্বরতরঙ্গের খাঁজগুলো উঁচুগ্রাম থেকে

নীচুগ্রামে ওঠানামা করে যখন, গলাতে যে সুন্দর ভাঁজ পড়ে কি অপরূপ দেখায়—এসব কথা বয়ান করতো। শুনে চাপা চাপা দীর্ঘশ্বাস ফেলতাম কেউ শুনতে না পায় মতো। কিন্তু নৃপেন প্রসঙ্গ পাল্টায় না। বলুক না-বলুক নতুন বৌয়ের নাম করে নৃপেন কিছু একটা বানিয়ে হলেও বলবে। এটা তার একটা স্থায়ী মুদ্রাদোষে দাঁড়িয়ে গেছে।

আমার ধারণা হলো আমি বোবা মেয়ে বিয়ে করেছি বলে এবং তার কর্তা বলেই আমাকে এসব কথা শুনিয়ে শুনিয়ে বলে। তখন থেকেই আমি নৃপেনকে ঘৃণা করতে আরম্ভ করলাম, মনে করতে লাগলাম, নৃপেন একটা বাজারের খানকি বিয়ে করেছে। একমাত্র খানকিরাই অতো বেশী হাসে, কথা বলে এবং এরকম বিশ্রী ভঙ্গি করে। প্রতিশোধ নেবার তীব্র ইচ্ছে মনের ভেতর ফণা ধরে জেগে উঠতো। কিন্তু আমার ইচ্ছে অনিচ্ছের কতটুক দাম! প্রেম কিংবা ঘৃণার পক্ষে বিপক্ষে কিছু করার ক্ষমতা আমার ছিল না। যে আইয়ুব খান অঘটনঘটনপটিয়সী ক্ষমতার প্রভাবে আমার শ্বশুরের মতো হেজী-পেজী মোক্তারকেও গণ্যমান্য সম্ভ্রান্ত মানুষে রূপান্তরিত করেছে, সম্ভব হলে সেই আইয়ুব খানকে ডেকে বলতামঃ হে প্রবল প্রতাপান্বিত আইয়ুব খান, তোমার লোহার ডাণ্ডাটি নিয়ে দয়া করে একটিবার এসো। নৃপেনকে মারধোর করতে যদি তোমার মতও ফিল্ড মার্শালের পৌরুষে বাধে, অন্তত চাকুরীটি খেয়ে তাকে কোলকাতা পাঠিয়ে দাও।

হায়রে! এসব ছিলও অক্ষমের কল্পনা মাত্র। বাস্তবে আমার শ্বশুর যেখানে বসিয়ে দিয়েছিলেন, তার বাইরে এক চুল হেলবার সাধ্যিও আমার ছিল না।

কয়েকদিন থেকে দেখছি নৃপেনের ভিন্ন অবস্থা। অপরিমিত যৌন সম্ভোগের ক্লান্তিতে সে একেবারে মিইয়ে গেছে। যখন তখন নতুন বৌয়ের নাম করে আর জ্বালাতন করে না। ফাইলপত্তরের সামনে বসে বড় বড় হাই তোলে। আর সকাল বিকেল রসের গল্প করে।

নৃপেন একটা স্কাউন্ড্রেল। আমার নিস্তরঙ্গ নিথর জীবনযাত্রার মধ্যে একটা জীবন্ত অতৃপ্তি ঢুকিয়ে দিয়েছে সে। এখন স্ত্রীকে আমি দু-চোখে দেখতে পারিনে। মাঝে মাঝে পাকা জুয়োড়ীর মতো মনোভাব জাগে। ইচ্ছে হয় শ্বশুর সাহেবের কাছে যেয়ে বলি, আপনি যা দিয়েছেন ঘর বাড়ী চাকরী সব নিন। বিনিময়ে কেবল আমাকে আপনারা বোবা মেয়ে রত্নটির দায় থেকে রক্ষা করুন। আমি সমগ্র জীবনের সমস্ত কিছুর বিনিময়ে এমন একজন মেয়ে মানুষকে কাছে পেতে চাই—যে কালো হোক, কুৎসিত হোক, না থাকুক তার গুণপনা, সে শুধু কথা বলবে, অনবরত কথা বলবে। তার মুখ থেকে নানা রকমের শব্দমালা শরতের বিবাগী বাতাসে শিউলী ফুলের মতো ঝরে পড়বে। কল্পনায় কতো মেয়েমানুষ সৃজন করি—তাদের সঙ্গে কতো কাল্পনিক কথোপকথন চালাই। বুকের গভীর থেকে শব্দরাজি থরে বিথরে নীলকান্ত মণির মতো জেগে ওঠে। গানের মতো সুরের ছোঁয়া লাগা, প্রাণের লাবণিভরা কথা ঝর্ণাধারার বেগে উছলে ওঠে। জীবনে নারীর সঙ্গে কথা বলার এমন তীব্র আকুতি কোনোদিন বোধ করিনি। নৃপেনের খোঁচা খেয়ে আমার ভেতরে আরো একটা আমির উদ্ভব হয়েছে। এই যে নিষ্ঠুর নির্মম ক্ষুধাবোধ এতদিন কোন গর্ভগুহায় লুকিয়ে ছিল জানতে পারিনি।

আগেই তো বলেছি, ইচ্ছেশক্তি বলতে কোনো কিছু নেই। তাই বলে আমি যে কিছু চাইনে একথা সত্যি নয়। নানা জায়গায় আমার যেতে ইচ্ছে করে, কিন্তু চরণ সামনে চলতে রাজী হয় না। অনেক কিছু করার সাধ জাগে কিন্তু অবশ হাত উঠতে চায় না। নানা আনন্দ বেদনার ধ্বনি আমার জিভের ডগায় পুঁটিমাছের মতো নাচলেও একটুকুর জন্য ঝরে পড়তে পারে না। এমন নিষ্ক্রিয় পুরুষ মানুষ আমি।

একটি সবাক সজাগ নারীর সঙ্গে কথা বলার কামনা বুকের তলায় রক্তবর্ণ বুদবুদের মতো জাগে আর ভাঙ্গে। অফিস থেকে আসা যাওয়ার পথে

রিকশা, বাস, পথের মোড়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে জটলা পাকানো তরুণীদের দিকে বাক্যের ক্ষুধা নিয়ে হাঁ করে দাঁড়িয়ে থাকি। নারীকণ্ঠ নিঃসৃত কলকাকলি শোনার জন্য সন্তর্পণে কানজোড়া পেতে রাখি। দমকা বাতাসে চারাগাছ যেমন কাঁপে তেমনি নারীর সুন্দর হাসির লহরী আমার বুকের স্তরে স্তরে কি আবেগেই না সমীরিত হয়। সে কথা কেমন করে বোঝাই।

প্রতিদিন অফিস শেষ করে বাসায় আসি। বোবা স্ত্রী আমাকে দোরগোড়ায় দেখলেই অপরিসীম আগ্রহ নিয়ে ছুটে আসে। সে যেন সারাদিন আমার বাড়ী আসার ক্ষণটির অপেক্ষায় দোরগোড়ায় তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। জুতো মোজা খুলতে সাহায্য করে, জামাকাপড় ছাড়তে হাত লাগায়। বাথরুমে ঢুকে হাতের কাছে সাবান তোয়ালে এগিয়ে ধরে। হাউমাউ করে চাকরানী মেয়েটিকে ইশারায় দুধ গরম করতে বলে। হাত মুখ ধুয়ে বেরিয়ে এলে নাস্তার প্লেট এবং ধূমায়িত চায়ের পেয়ালা নিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। এসব আদিখ্যেতা দেখে আমার বিরক্তি ধরে যায়। লাথি মারতে ইচ্ছে করে..... পারিনে অভ্যেস নেই বলে। চা-টা শেষ করে অন্যদিকে মুখ ফেরাই। সে বুঝতে পারে আমার মন খারাপ। বোবাদের ঘ্রাণশক্তি বড় তীক্ষ্ণ। কথা যে বলতে পারে না এ বিষয়ে পুরো সজাগ। তাই সেবা দিয়ে কথার অভাব ভরাট করতে চায়। পুরুষ মানুষের সেবায় কতদিন চলে। আমার দরকার অন্য কিছুর। আমি মনের সাধ মিটিয়ে কথা বলতে চাই। তাজা উষ্ণ, রূপরাঙা, রসরাঙা কথা আমার মনের বৃন্তে বৃন্তে বসন্তের পল্লবের মতো মুকুলিত হয়। মুকুলিত হয় আর ঝরে যায়। সমস্ত হৃদয় মনের আকুতি দুখানি কালো চোখের তারায় থরো থরো নাচে। বিশাল কালো চোখে চোখ পড়ে কখনো বা মনটা আপনা থেকেই ধক করে কেঁপে যায়।

গম্ভীর হয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে থাকি। ভেতরের তাপে চাপে ওপরের আবরণ খান খান হয়ে ভেঙে পড়তে চায়। দুর্বলতার টুঁটি চেপে ক্ষেপে উঠতে

চেষ্টা করি। পারিনে। এ ধরনের মানসম্মান বোধহীন মেয়ে মানুষের সঙ্গে রাগ কেমন করে করতে হয়, তাও আমি জানিনে। হাবাগোবা মোমের পুতুলের মতো এমন পুরুষ মানুষ আমি। আমাকে দিয়ে জীবনের কোনোদিকের সীমা অতিক্রম হল না। জ্বলবো, পুড়বো, ব্যথা পাব অথচ কিছুই করতে পারবো না, কিছুই বলতে পারব না, কোথাও যেতে পারব না।

আমার এদিকে বুকটা ভয়ে টিপটিপ করে। কি জানি শ্বশুর সাহেব যদি টের পেয় যান তার মেয়েটিকে আমি অবহেলা করছি। চাকুরী খেয়ে মেয়েটা ফিরিয়ে নিয়ে বলেন, 'এখন বোনটির হাত ধরে যেখানে ইচ্ছে চলে যাও', তখন কোথায় কোন বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়াবো?

আমি আইয়ুব খান সাহেবকে কাজে খাটাতে পারিনে। তিনি শ্বশুর সাহেবের হাতে যে পরিমাণ ক্ষমতা গচ্ছিত রেখেছেন, আমি তো তিঁতপুঁটি, তাই দিয়ে অনেক রুই-কাতলাও ঘায়েল করা যায়। আমার মনটা বড় সন্দেহপ্রবণ। দুর্বল কি না! দুর্বলেরা ভারি সন্দেহ বাতিকগ্রস্ত হয়। এইরকম মানসিক সন্ত্রস্ততার মধ্যে বেশ কিছুদিন কাটিয়ে দিলাম। সে সময়ে আমার অর্ধেক চুল পেকে গেছে। ওজন আট পাউন্ড কমেছিল। এখন মনে হয় নরক বাস করেছিলাম।

আমার বোনটা ছোটবেলা থেকেই আমাকে ভয়ানক ভয় করে। বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সে আরো দূরে সরে গেছে। আগে এক আধটু কাছে ঘেঁষত। এখন তাও না। নিজের মনে সব সময়ে একা থাকে। স্কুলে যায় আসে, মৃদুস্বরে পড়া মুখস্থ করে। ছোট্ট তক্তপোশখানিতে একা একা ঘুমোয়। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে একজন পুরুষ ছেলের কথা ভাবে কিনা আমি বলতে পারব না।

মা মরা মেয়েটির এই নিঃসঙ্গ জীবনযাত্রা দেখে কতবার আমার মনটা হু হু করে নিঃশব্দে কেঁদেছে। অনেকবার ভেবেছি তাকে একটু আদর করব, মাথায় হাত বুলিয়ে দেবো, একটা সুন্দর জামা, দুগজ চুলের ফিতা কিনে

দেবো। একদিন সিনেমায় নিয়ে যাব। কিন্তু অনভ্যেসবশত এসবের কিছুই করতে পারিনি। তাই বোনটি যেমন আছে তেমনি রয়েছে। চোখের কোণায়, মুখাবয়বে ভয় পাওয়ার সে প্রাচীন গ্রামীণ চিহ্নটি এখনো অক্ষয় হয়ে জেগে আছে।

মানসযন্ত্রণার এই সময়ে আমি বড় অসহায় হয়ে পড়েছিলাম। ধারেকাছে কেউ নেই যে একটু গভীর কথা বলে বুকের ব্যথা লাঘব করি। ব্যথা মনে পাষানের মতো চেপে থাকে। কি করি, কোথায় যাই। কার কাছে যেয়ে মনের এই অদ্ভুত বেদনার কথা প্রকাশ করি। মনের ভেতর যে ক্ষিপ্র স্রোতোবেগ জাগছে কোথায় আছে এমন পরম বান্ধব যার কাছে যেয়ে সব অকপটে প্রকাশ করি। এই পৃথিবীতে আমার তো আপনার জন বলতে কেউ নেই।

এই সময়ে ছোট বোনটির সঙ্গে একটু একটু করে কথা কইতে থাকি। পয়লা তো সে আমার কাছেই ঘেঁষত না। একটা কিছু জিজ্ঞেস করলে জবাব দেবার সময় পাঁচবার তোতলাত। তিনবার মুখের দিকে করুণভাবে তাকাত। মনে মনে আশা করতাম বোনটি এইবার কথা বলুক। ভাইজান বলে ডাকুক। অসীম উৎকণ্ঠায় প্রতিদিন প্রতীক্ষা করি। কিন্তু বোনের কণ্ঠে সে আকাঙ্ক্ষিত ধ্বনিটি শুনিনে। অনাদরে অবহেলায় তার মধ্যে যে নির্বাকতার সৃষ্টি করেছি, কিছুতেই সে দেয়াল ভাঙলো না। অগত্যা নিজেই উদ্যোগী হয়ে তার সঙ্গে এটা সেটা নানা কথা কইতে থাকি। এই কথাবার্তার প্রভাবেই আমি অনুভব করলাম আমার মানসিক স্থিতিশীলতা ফিরে আসছে।

এভাবে কিছুদিন যাবার পর আমরা অত্যন্ত সহজভাবে পরস্পরের সঙ্গে কথা কইতে থাকি। তারপর থেকে আমার দু'ভাইবোনে কথা বলতাম। গ্রামের বাড়ীর কথা, বাবা-মার কথা, অদ্ভুতকর্মা পূর্বপুরুষদের কথা। আমাদের পরিবারের ঘুমন্ত ইতিহাস ভাইবোনের কথোপকথনের মধ্য দিয়ে চমকে চমকে জেগে উঠত। অবলীলায় কথা বলতে শুরু করার পর থেকে আমি উপলব্ধি করি

যে আগের সে ভীত-সন্ত্রস্ত ভাবটি কেটে গেছে। মানসিক অভাববোধ আমাকে আর ক্ষ্যাপার মতো তাড়িয়ে নিয়ে বেড়ায় না।

একদিন এক বন্ধুর বউয়ের গলায় গান শুনে চট করে ধারণা করে ফেললাম। বোনটিকে গান শেখাবো। এটা আমার বোবা মেয়ে বিয়ে করার প্রতিক্রিয়া কিনা বলতে পারব না। অনেক খোঁজখবর করার পর ভালো এবং বুড়ো দেখে একজন গানের মাস্টার ঠিক করে দিলাম।

পাঁচ

এখন আমার মানসিকতার শেকড়ে শেকড়ে নতুন রসের রসায়নের লীলাখেলা চলছে। তার কার্যকারণসূত্রের সমস্ত রহস্যটা আমার কাছেও সুস্পষ্ট নয়। তবু বলি, বোনটি গান-বাজনায় বেশ সুন্দর উন্নতি করছে। এটা যে কেমন করে সম্ভব হলো তা আমি নিজেও বলতে পারব না। আমাদের পরিবারে কোনকালে গান বাজনার চর্চা ছিল না। হয়তো এমন হবে আমার বাবার রক্তের যে বাসনা, যে কামনা পাথরের ভেতর কীটের মতো বন্দী হয়ে ছিল, তাই-ই আমার বোনের কণ্ঠস্বরে রঙিন কুয়াশার মতো মুক্তিলাভ করছে। আমি যে কতো খুশী হয়েছিলাম!

যাক আসল কথায় আসি। এই সময় থেকেই স্ত্রীকে সম্পূর্ণ নতুন দৃষ্টিতে দেখতে আরম্ভ করলাম। একটা ছোট্ট ঘটনাই তার কারণ। তাই সেটা বিবৃত করি। একদিন সন্ধ্যাবেলা আমি অফিস থেকে ফিরেছি। কি কারণে মনে পড়ছে না, সেদিন ফিরতে একটু দেরী করে ফেলেছিলাম। আমি তো বোবা স্ত্রীর স্বামী। তাই অফিস থেকে ফিরে অযথা কাউকে ডাকাডাকি করে বিড়ম্বনা বাড়াইনে। সেদিনও চুপি চুপি গেট খুলে ঘরে ঢুকি। আমার বোন তার থাকার ঘরটিতে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গানের প্র্যাকটিস করছে। গলার স্বর উঁচু পর্দা থেকে নীচু পর্দায় নামছে। নীচু থেকে উঁচুতে চড়ছে। স্বরতরঙ্গের এই লাস্যময় উত্তরণ অবতরণ ধারায় প্রাণের যে মাধুরী রক্ত-সন্ধ্যেয় ব্যক্ত হচ্ছে তা ঘরের বাতাস পর্যন্ত মধুময় করে তুলেছে। আমার বোন নিজের মনে গান-বাজনা করছে। আর আমার বোবা স্ত্রী বদ্ধ দরোজার সামনে দাঁড়িয়ে। তার গলা দিয়ে গো গো আওয়াজ নামছে। বাতির আলোতে একফালি কপাল দেখতে পাচ্ছি দ্বিতীয়ার চাঁদের মতো সুন্দর। চোখ থেকে ফোটায় ফোটায় জল গড়িয়ে পড়ছে। সারা শরীর থর থর করে কাঁপছে। কোনো অসুখ বিসুখ নয়তো! হাতে পায়ে বিশ্রী

রকম খিল ধরার অবস্থা। সচরাচর সে তো এমন করে না। কাউকে না ডেকে রহস্যটা উদ্ঘাটন করার সংকল্প নেই। বেশ খানিকক্ষণ লাগল বুঝতে।

আমার বোন গান গাইছে আর বোবা স্ত্রী সকলের অলক্ষ্যে প্রাণপণ প্রচেষ্টায় বোনের সুরেলা কণ্ঠের সঙ্গে নিজের নির্বাক কণ্ঠটি মেলাবার চেষ্টা করছে। চমৎকার অনুসরণ প্রক্রিয়া। কিন্তু পারছে না। সে তো বোবা। তার বাকযন্ত্রটি কাজ করে না। কিন্তু শরীরের অণু-পরমাণু এই অক্ষমতা মেনে নিতে রাজী নয়। তাতে করে হিস্টিরিয়া রোগীর মতো খিল ধরছে। সমস্ত শরীর থেকে যে প্রচণ্ড প্রয়াস স্ফুরিত হচ্ছে, তাই তারই তোড়ে গলা দিয়ে গোল গোল নুড়ি পাথরের খণ্ড খণ্ড শব্দাংশ ঝরে পড়ছে। সেটা ভাষা নয়। গাড়ী স্টার্ট দেয়ার পূর্বে যে ধরনের আওয়াজ দেয় তেমনি ধরনের একটা কিছুর সঙ্গে তুলনা করা যায়।

সেদিন থেকে স্ত্রীর প্রতি আমার মনোভাবটা সম্পূর্ণ পালটে গেলো। বুঝতে বাকী থাকল না, তার মনের ভেতর কথা বলার আকাঙ্ক্ষা কি রকম জলপ্রপাতের ধারার মতো ফুলে ফুলে উঠছে। তার কণ্ঠও সুন্দর ধ্বনির প্রসূতি হতে তীক্ষ্ণভাবে আগ্রহী। একজন মানুষ কথা বলতে পারে না, এটা কত দুঃখের!

যেটা আমাকে সবচেয়ে বেশী নাড়া দিয়েছে আমার স্ত্রী বাকশক্তিহীন দশাটিকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেয়নি। তার শরীরের প্রতিটি কণা, প্রতিটি অণু-পরমাণু এই বোবাত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বিক্ষোভে ফেটে পড়তে চায়। আমি নিজের চোখে তো দেখলাম। তারও মনের গভীরে ফুলের স্তবকের মতো কথা স্তরে স্তরে সাজানো রয়েছে। তার মনের ভেতর সুখ-দুঃখের আকারে যা ঘটছে এবং বাইরের পৃথিবীতে সুন্দর কুৎসিত যা বিরাজমান রয়েছে, প্রতি মুহূর্তেই পরিবর্তিত হচ্ছে—সবকিছুরই একটি নাম আছে। এই নামটিকেই সে প্রকাশ করতে চায়। কিন্তু পারে না। বাকযন্ত্রটি খারাপ এবং অকেজো বলে।

এই ক'দিন আগে আমিও তো মনের খনিজ তিমিরে মধুর গুঞ্জরণশীল পাখনাযুক্ত শব্দ ভাণ্ডার পরম দুঃখে আবিষ্কার করেছি। শুধু মেয়েমানুষের সঙ্গে কথা বলার জন্য কেমন উন্মত্ত হয়ে উঠেছিলাম। আমার বৌটির অবস্থা তার চাইতে ঢের ঢের করুণ। তার আকাঙ্ক্ষা অনেক বেশী গভীর, দাবী অনেক বেশী বাস্তব এবং জোরালো। স্ত্রীর প্রতি দরদ এবং মমতায় সমস্ত অন্তর মথিত হয়ে উঠল। সে রাতে তাকে অত্যন্ত কোমলভাবে আদর করলাম। স্বামী হিসেবে জীবনে যে সব করিনি সব করলাম। হঠাৎ আদরের ঘটা দেখে সে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। স্ত্রী জীবনে কোনদিন আদর মমতার মুখ দেখেনি। খুবই ছোট্ট বয়সে মাকে হারিয়েছে। সৎমার সংসারে মানুষ। আমি তো একজন নিষ্ক্রিয় পুরুষ। হাতের কাছে যা পাওয়া যায়, তার বাইরে কিছু আছে বা থাকতে পারে একথা মনে একবারও উদয় হয়নি। আসলে আমার শ্বশুর সাহেব মোক্তারি বুদ্ধি দিয়ে যা সম্ভাবিত করেছিলেন তাই নিয়েই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম।

গুণী বাজিয়ের হাতে পড়লে বেহালার তারের তড়িৎ যেমন অপরূপ শিখায় জ্বলে ওঠে তেমনি তার সমগ্র সত্তা আমার প্রতি স্পর্শে কেঁপে কেঁপে উঠছিল। চোখে ঘুম নামছিল। আধঘুমের মধ্যে অনুভব করলাম আমার বৌটি কাঁদছে...আহা কাঁদুক।

মাঝরাতে উঠে বাথরুমে যাবার জন্য বাতি জ্বললে দেখি সে একাকী জানলার পাশে হাতের ওপর মুখ রেখে বসে রয়েছে। খুব দূরে শিবির পাতার জালের ভেতর দিয়ে ধীরে ধীরে একখণ্ড কৃষ্ণ পক্ষের ম্লান চাঁদ উঠে আসছে। তার মুখমণ্ডলে দেবীর মতো বিকশিত মহিমা। হাত ধরলে পায়ে পায়ে বিছানায় চলে এল। সারারাত একতাল কাদার মতো আমার শরীরের সঙ্গে লেগে রইল।

ছয়

দুচারদিন পর শরীর খারাপের নাম করে একটানা দুই মাসের ছুটির দরখাস্ত দিলাম। আমাকে ছুটি নিতে দেখে অফিসের সমস্ত মানুষ বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল। চোখের ওপর দিয়ে প্রতি বছর শীত বসন্ত গড়িয়ে গেছে, গ্রীষ্ম বর্ষা অতীত হয়েছে। শরৎ হেমন্তে দেখেছি কখনো বা অফিসের নুলো পিয়নটিও যথারীতি ছুটি ভোগ করে অপরিমিত প্রাণোচ্ছাস নিয়ে গ্রামের বাড়ী থেকে ফিরে এসেছে। আমার যে কি করে চলত, কি করে যে আমি এই ছোট্ট অফিস কামরার মধ্যে নিজেকে আটকে রাখতাম, তা বলতে পারব না।

সে যাক দুমাসের ছুটি নিলাম। বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক একরকম চুকিয়ে দিয়ে বাসায় এসে ডেরা পাতলাম। এ দুটি মাসই ছিল আমার জীবনের সবচেয়ে সুখের সময়। সকাল সন্ধ্যে ঘরে থাকি। খুঁটিনাটি কাজে মন দেই। আমারা স্বামী-স্ত্রী বিয়ে হওয়ার বহু বছর পর আবার নব বিবাহিত দম্পতির মতো জীবন শুরু করলাম। প্রতিটি দিনকেই যেন আমারা দুজনে অস্তিত্বের ভেতর থেকেই সৃষ্টি করে নিচ্ছিলাম। প্রতিটি ঊষা রাঙা নিমন্ত্রণলিপি মেলে ধরে। দিনগুলো ঝকঝকে নতুন প্রাণবন্ত। অফুরন্ত স্বাদ রস-গন্ধে সারা মন প্রাণ ভরিয়ে দিয়ে যায়। রাতগুলো বিধাতার আশীর্বাদের মতো সন্ধ্যের স্বর্ণতোরণ দিয়ে কেমন কান্তিমান ভঙ্গীতে নেমে আসে।

আমি আজকাল ফুর্তিবাজ হয়ে উঠেছি। স্ত্রীটিও বেশ সুন্দরী হয়ে উঠেছে। জীবনের জল তার সারা শরীরে ঝলকাতে লেগেছে।

অঙ্গে লাবণ্যের স্রোত নতুন গাঙের মতো ঢল ঢল করে। আজকাল সাজ পোশাকের দিকে তার নজর বহুগুণে বেড়ে গেছে। আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখে। মাথা ভর্তি কালো চুল ছেড়ে দিলে পিঠ ঝেঁপে যায়। ইচ্ছে হলে গোল করে খোপা বাধে। ইদানীং দুয়েকটা ফুল গুঁজতেও শিখেছে। মৌসুমী ফলের চারা লাগিয়েছি ক’টি। পরনের শাড়ী শক্ত করে

কোমরে পেঁচিয়ে সকাল দুপুর জল ঢালে। তরুশিশুদের পুত্র-কন্যার স্নেহে লালন করে তখন তাকে ঠিক আশ্রম কন্যার মতো মনে হয়। সমস্ত শরীরে সরল সৌন্দর্য ফুলের গর্বে ফুটে থাকে।

বোনের গানের রেয়াজ করার সময়টিতে ইচ্ছে করে আমি ঘরে থাকিনে। স্ত্রী স্বরগ্রাম অনুকরণ করার প্রয়াসটি লুকিয়ে লুকিয়ে দেখি। হাত পায়ের খিল ধরা অবস্থাটিকে এখন আকার পাওয়া সুন্দর সুমিত একটি পিপাসার মতো লাগে। এমনি করেই বুঝি প্রাচীনকালে সাধনাকে অপ্সরারা মুনি ঋষির ধ্যান ভাঙাত। তার এই নীরব একমুখী সাধনাকে মনে মনে প্রকৃতির হ্লাদিনী শক্তির সঙ্গে তুলনা করে কৌতুক বোধ করতাম। আমার বোনের গানের চেয়ে মধুর, পৃথিবীর সেরা নর্তকীর নাচের মুদ্রার চাইতে দৃষ্টিহারী অনুপম তুলনাবিহীন। বোধ হয় এই সুন্দরের সাধনার বলেই দিনে দিনে সে সুন্দরী হয়ে উঠছে। আমার চোখে তার বোবাত্ব ঘুচে গেছে। প্রতিটি ভঙ্গীই এখন আমার মনে শ্রেষ্ঠতম কবিতার আমেজ জাগিয়ে তোলে। তার এই প্রচেষ্টা ফাল্গুনের ফুল ফোটাবার জন্য শীতে সাধনার মতো গোপন এবং কঠিন। যখন তখন তাকে আমি চুমো খাই। তার মুখমণ্ডলে একটা অসহায় ভাব জলছবির মতো আপনা আপনি ভেসে উঠে—দেখলে মনের ভেতর কি যে দুঃখস্রোত বয়ে যায়। মানুষ কেননা বোবা হয়ে জন্মায়? বোবারও বা কথা বলার অত সাধ জাগে কেন?

একদিন মাঝরাতে ঘুম ভাঙলে দেখি সে বিছানায় নেই। বাথরুম খুঁজলাম, বারান্দা খুঁজলাম! এঘর ঘর তালাশ করে, বোনের গানের প্র্যাকটিস করার ঘরে দেখি হারমোনিয়ামটাকে বাচ্চা শিশুর মতো কোলে নিয়ে বসে। খুব সন্তর্পণে একেকটা রীড টিপছে। একবার টিপে একবার ওদিক তাকায়। বড় ভয়, পাছে কেউ দেখে ফেলে। হারমোনিয়াম থেকে মিহি স্থূল আওয়াজ বের হবার সঙ্গে সঙ্গেই তার মুখে রঙের বদল ঘটছে। জানলার পাশ ধরে দাড়িয়ে অনেকক্ষণ এ দৃশ্য দেখলাম। শেষে ঘরে ঢুকি। তার চোখে মুখে একটা

অপরাধীর ভাব। হাত ধরতেই সে সঙ্গে সঙ্গে ঘরে চলে এল। এই আগুনের মতো প্রয়াসের বিফলতার কথা চিন্তা করে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস বুকের ভেতর জমিয়ে ফেললাম।

আরো একদিন এমন হলো। আধারাতে উঠে দেখি সে বিছানায় নেই। বোনের ঘর, হেঁশেল, বাথরুম সবখানে তন্নতন্ন করে দেখি। আচমকা একটা সন্দেহের ছায়া মনের ভেতর দুলে উঠে। তবে কি—! কোথায় গেল সে?

নিঃশব্দে দরোজা খুলে পেছনের পুকুরের দিকে যাই। দেখি সে ঘাটলার ওপর বসে। গলা দিয়ে বিনা প্রযত্নেই সে গোঁ গোঁ আওয়াজ বেরিয়ে আসছে। তা হলে প্রক্রিয়াটি এই অল্প সময়ের মধ্যে সে আত্মস্থ করে ফেলেছে। আকাশে থালার মতো একখানা চাঁদ জেগে। কুয়েতে গাছের বাঁকা ছায়াগুলো আরো বাঁকা হয়ে জল খেতে নেমেছে। অল্প অল্প বাতাসে নারকেল গাছের চিরল পাতাগুলো কাঁপছে। রাতের শিশিরে সিক্ত পাতাগুলো চাঁদের আলোর স্পর্শে চিক চিক জ্বলছে। একঝাঁক নক্ষত্র ফুলের মতো ফুটে আছে। প্রস্ফুটিত নক্ষত্রের ভারে প্রণত হয়ে পড়েছে আকাশ। শহর নীরব। মাঝে মাঝে মৃদু অতি মৃদু শব্দ শোনা যায়। মনে হয় গভীর ঘুমে চন্দ্রালোকিত নিশিরাতে পাশ ফিরে নিঃশ্বাস নিচ্ছে। এরই মধ্যে বাক্যপ্রার্থিণী রমণীর গলায় গোঁ গোঁ আওয়াজ রাতের ছন্দিত হৃৎপিণ্ডের মতো একটানা শব্দ করে যাচ্ছে। গোটা শহর মৃত-ঘুমন্ত। আমি গিয়ে সামনে হাজির হলাম। সে নজরও দিল না। আমিও যেন সারবন্দী নারকেল গাছের একটি। আপন মনে তার কাজ করে যায়। কি করে বুঝে গেছে তার এ কাজ আমি অপছন্দ করছিনে। প্রায় ঘণ্টাখানেক ধরে এই স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটার পাশে গাছের মতো দাঁড়িয়ে থাকলাম। একসময় আওয়াজ আপনা থেকেই বন্ধ হয়ে এল। মনে হল প্রবল বেগে চলার পর একটা পাম্পিং মেশিন থামল। ঘাটলার ওপর চিত হয়ে শুয়ে অনেকক্ষণ কাতলা মাছের মতো শ্বাস টানল। আরো কিছুক্ষণ পর নিজেই আমার হাত ধরে ঘরে নিয়ে এল। আমার বড়

ভালো লাগল। এমনি করে বিস্ময় পরিস্ফুরিত দৃষ্টিতে প্রতিদিন স্ত্রীকে দেখছিলাম। প্রতিদিনই মনে হয় নতুন। যতোই দেখি আশ মেটে না। ইচ্ছে হয় আরো দেখি—আরো।

একদিন ছোট বোনটি স্কুল থেকে এসে বলল, জানো দাদা এক ব্যাপার হয়ে গেছে? আমি জিজ্ঞেস করলাম, কী রে? পয়লা সে মুখ টিপে হাসলো। তারপর বলল, স্কুল থেকে ফিরে দেখি ভাবী হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান গাইছে। তারপর মুখে আঁচল দিয়ে হাসি চাপতে অদৃশ্য হয়ে গেল। বোনটিকে সেদিন বড় ফাজিল এবং নিষ্ঠুর মনে হল। কয়েকদিন পরই বাজারে রাষ্ট্র হয়ে গেল আমার বোবা বৌ হারমোনিয়াম বাজিয়ে গান করে। দাসী চাকরদেরও এ কথা বলাবলি করতে শুনলাম। লজ্জা শরমে মাটির সঙ্গে মিশে যাচ্ছিলাম। সে তো নিজে কথা বলে না, তাই লোকের কথায়ও তার কিছু আসে যায় না। কিন্তু আমি তো কথা বলা সামাজিক জীব। লোকমুখের রটনা আমি অগ্রাহ্য করব কেমন করে!নেই। স্ত্রীর এই প্রচেষ্টাটি য়অথচ মুখ ফোটে কিছু বলব তার উপা ছিল আমাদের দু’জনেরই গোপন কঠিন সাধনা। সেটি প্রচার হয়ে গেছে। তাকে উলঙ্গ করে রাস্তায় ছেড়ে দিলেও বোধ হয় এ রকম ব্যথা পেতাম না।

সাত

দেশের পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছিল। যেখানে দেশের গভীর ব্যথা, মার্শাল সাহেবের গোমড়ামুখো সৈন্যেরা সেখানেই কাঁটা বসানো বুটজুতোর লাথি মারে। প্রথম প্রথম গোটা দেশ আঘাতের বেদনায় গঙিয়ে উঠত। ক্ষত থেকে রক্ত বের হত। আওয়াজে যন্ত্রণা ফুটে থাকত। প্রায় এক যুগ ধরে লাথি খেয়ে ব্যথা জর্জর অংশ ডাঁটো হয়ে উঠেছে। এখন প্রতিবাদ করার জন্য মুখিয়ে উঠছে। যন্ত্রণা, বেদনা এবং দুঃখের কারখানা থেকেই প্রতিরোধের শানানো আওয়াজ ফেটে ফেটে পড়ছে। তার ধার যেমন তীক্ষ্ণ, ভারও তেমনি প্রচণ্ড। সারাদেশে শ্লোগানের ঢল নেমেছে। পথে ঘাটে মানুষ—কেবল মানুষ। চন্দ্রকোটালের জোয়ারের জালের মতো বইছে মানুষ। বাংলাদেশের রাস্তাগুলো নদী হয়ে গেছে। তাদের চোখে আগুন, বুকে জ্বালা, কণ্ঠে আওয়াজ, হাতে লাঠি। রৌদ্রোজ্জ্বল দুপুরে স্লোগানের ধ্বনি বাংলাদেশের আকাশমণ্ডলের কোটি কোটি বর্শাফলার মতো ঝিকিমিকি খেলা করে।

শেখ মুজিব জেলে। আগরতলা মামলার বিচার চলছে। এখানে এখানে বোমা ফুটছে, মিটিং চলছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মিছিল বেরিয়ে আসে। গুলী চলে। লাল তাজা খুনে শহরের রাজপথ রঞ্জিত হয়। সরকারী পত্রিকায় অফিসগুলোতে হুতাশনের মতো প্রলয়কারী অগ্নিশিখা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। প্রতিটি সকালেই খবরের কাগজের পাতা উল্টালেই টের পাওয়া যায় ভয়ংকর কিছু একটা হতে যাচ্ছে। গতিকটি সুবিধের নয় মনে হল। আইয়ুব খানের সিংহাসন ঝড়ে পাওয়া নায়ের মতো টলছে। শক্ত মানুষ ফিল্ড মার্শালের জন্য চিন্তিত হলাম। মার্শাল যদি যান আমার শ্বশুরও তো চিৎপটাং হবেন। যাদের করুণার বদৌলতে আমি পাড়াগাঁয়ের ধূলিশয্যা থেকে এই বড় কর্তার আসনে উঠে এসেছি, তাঁরা সকলে যাবেন অথচ আমি একা থাকব সে কেমন করে হয়।

শ্বশুরের জন্য চিন্তিত হলাম। কথাটি পুরি সত্যি নয়। আসলে আমার মনেই দুশ্চিন্তা শত শত হুল ফোটাচ্ছিল।

যুগের হাওয়ার প্রচণ্ড একটা অস্থিরতা। কোথাও শান্তি নেই। বাতাসে বাতাসে মোচড় খেয়ে ঘূর্ণি হাওয়া যেমন বেগ সঞ্চয় করে, তেমনি মানুষের ক্ষোভ রুদ্ধ আক্রোশে ফুলে ফুলে একটা সৃষ্টিনাশা ঝড়ের আকার ধারণ করছিল। যেখানেই যাই—দেখি তোলপাড় লণ্ডভণ্ড অবস্থা। বিপদ ঘনিয়ে এলেই আমি কোনো বিষয়ে স্থিরভাবে চিন্তা করতে পারিনে। বলির পাঁঠার মত নির্বিকার দাঁড়িয়ে সর্বনাশের প্রতীক্ষা করি। বাইরের দিক থেকে আমার মানসিক অবস্থা কারো অনুমান করার উপায় নেই। আমার চিন্তা চাঞ্চল্যহীন নির্বিকারত্বকেই লোকে ক্লাসিক স্থিরতা বলে মনে করে। এত বেশী শুনেছি যে কথাটা নিজেও প্রায় বিশ্বেস করে ফেলেছিলাম।

চুপচাপ বসে থাকি। অফিসে যাওয়া আসার পথে পারতপক্ষে ডাইনে বাঁয়ে তাকাইনে। রাতের অন্ধকারে বেবাক রাস্তায় কারা সব ভয়ংকর পোষ্টার সেঁটে রাখে। পোস্টারের বুকে সর্বনাশের লাল সংকেত জ্বলজ্বল করে। তাই ভাবুকের মতো আকাশের দিকে তাকাই। সেখানেও মাঝে মাঝে দেখতে পাই, মেঘে মেঘে ঘষা লেগে বিজলীর বাঁকা ছুরি ঝলসে উঠে। বজ্র ফেটে পড়ে। প্রকৃতির রাজ্যের নিটোল শান্তি ভাঙ্গার অপরাধে আকাশের দেবতাকে অভিযুক্ত করি। পত্রিকা পড়া ছেড়ে দিয়েছি। পত্রিকাঅলাদের আমি বিশ্বেস করিনে। কি করে করব। আমার শ্বশুর সাহেব যে পত্রিকাটিকে তাঁর প্রভাব খাটিয়ে ব্যাঙ্ক থেকে লোন পাওয়ার ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন, দেখলাম সে ব্যাটাই আমার শ্বশুরের দলের বিরুদ্ধে তেজালো লেখা লিখছে। বাজারের কসবিকে বিশ্বাস করা যায়, কিন্তু পত্রিকাঅলাদের নয়।

আগে অল্প স্বল্প এটাসেটা পড়াশোনা করতাম। এখন সব ছেড়ে দিয়েছি। উসকোখুসকো লাগলে নবযুগ ডাইরেকটরী পঞ্জিকার পাতা উল্টোই। রাশি

বর্ষফল দেখি। মেহ-প্রমেহ ইত্যাদি যৌন রোগের বিজ্ঞাপন চোখে বুলোই। তাছাড়া আর কি করার ছিল আমার। দেখতে পাচ্ছিলাম চারিদিকে সব দুমড়েমুচড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছে। আমার মনের গহনে তখনও একটা নিশ্চিন্তি বোধ নোঙরের মতো অটুট ছিল।

আমি জানতাম আমার একটা বৌ আছে। ছায়াময় উদ্যানকুঞ্জের মতো সে বৌয়ের একখানা স্নেহ প্রবণ মন আছে। এই বিশ্বসংসারে একমাত্র আমিই সে মনের খবর জানি। সে তো বোবা। মানুষের জয় পরাজয় উত্থান পতনে তার কিছু যায় আসে না। সুতরাং মানুষও সে মনের কোনো খবর জানত না। সময়ে অসময়ে জাগতিক অশান্তি অস্থিরতা আমাকে ভয় করলে, মরুভূমির পথিক যেমন পান্থপাদপের ছায়ায় এসে দাঁড়ায়, তেমনি ছায়ায় গিয়ে দাঁড়াব ভেবেছিলাম। আমার সুখ-দুঃখ সব কিছুর ওপর তার মনের অনাবিল শান্তি প্রসন্ন মাধুর্যে ভরিয়ে দেবে। কল্পনা করে সুখ, আমিও কল্পনা করেছিলাম।

আট

মিছিল আমি দু-চোখে দেখতে পারিনে। শ্লোগানের আওয়াজ শুনলেই আমার কানে খিল ধরে। বোধশক্তি হারিয়ে ফেলি। মনে করতাম মিছিলকারীরা হাজার হাজার ধারালো বর্শা দিয়ে আমার সারা শরীর খোঁচাচ্ছে। তাই মিছিলের আনাগোনা দেখলেই দরোজা জানালা বন্ধ করা আমার একটা প্রিয় অভ্যেসে দাড়িয়ে গিয়েছিল। এভাবে মনে করতে চেষ্টা করতাম ওরা ঠিক আমার সামনে নেই। অনেক দূরে রয়েছে। এ ধরনের চিন্তা করে অনেকটা স্বস্তি বোধ করতাম। তারপরেও মিছিলের আওয়াজ শোনা গেলে কানে হাত চাপা দিয়ে রাখতাম। এ ভাবে কালের ঝড়কে ঠেকাবার আশ্চর্য কৌশল আমি আয়ত্ত করেছিলাম। পরে জেনেছি এ ব্যাপারে স্বয়ং মরহুম আইয়ুব খানের সঙ্গে আমার মিল রয়েছে।

এই সময়ে বৌটির একটি সংশোধনের অযোগ্য ত্রুটি আমার চোখে বড় স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে। মিছিলের ঘ্রাণ পেলেই সে দরোজা জানালা হাট করে খুলে রাখে। কি করে খবর পেয় যায় জানিনে। শুনেছি বোবার কানে খাটো। তবু কি করে এমন ব্যাপার ঘটে আমি বলতে পারব না। মিছিল আসতে দেখলেই উন্মুখ হয়ে কান পেতে শোনার চেষ্টা করে, ওরা কি বলছে। সূর্যমুখী যেমন সূর্যের সামনে প্রতিটি পাপড়ি মেলে ধরে আলো হতে তাপ হতে প্রাণকণা শুষে নিয়ে ফুটে ওঠে; সেও তেমনি আবেগে মিছিলের সামনে এক জোড়া উৎকর্ণ শ্রবণ বিছিয়ে রাখে। দ্রুত পায়ে মিছিল আসে, দ্রুত পায়ে চলে যায়। কিন্তু তারপরেই অঙ্গ প্রত্যঙ্গে অবিরাম ঢেউ খেলতে থাকে। মিছিলের ধ্বনি তার অন্তর্লোকে চুম্বকের মতো ক্রিয়া করে। আপনা থেকেই চোখজোড়া ঝিকিয়ে উঠে দুহাতে শক্ত করে জানালার শিকগুলো আঁকড়ে ধরে সমস্ত চেতনা জনারণ্যে আর শব্দারণ্যে কামানের গোলার মতো ছুঁড়ে মারে। আর গলা দিয়ে আপনা

থেকেই গো গো শব্দ নির্গত হতে থাকে। কোনোরকম প্রযত্ন প্রয়াসের প্রয়োজন হয় না। অনির্দিষ্ট কাল ধরে একটা ভৌতিক প্রক্রিয়া সমস্ত শরীরে চলতে থাকে।

শরীরময় প্লেনের প্রপেলারের মতো কি একটা ভন ভন বেগে ঘুরতে থাকে। তার অভিব্যক্তিটাই শুধু বাইরে প্রকাশ পায়। কতবার তাকে ঈশারা ইঙ্গিতে অমন না করতে বলেছি। বোবাকে বোঝাব তেমন সাধ্যি আমার কোথায়? তার আবার কথা বলার সাধ গেছে। এখন কাউকেই সে কেয়ার করে না। মিছিল এলেই কায়দা করে জানলার সামনে দাঁড়ায়। আর স্বয়ংক্রিয় ব্যাপারটা আপনা থেকেই শুরু হয়। এ যেন বৈষ্ণবদের গোঁসাই দেখে দশা পাওয়ার অবস্থা। লোকজন এটাকেও বোবাত্বের আরেকটা উপসর্গ হিসেবে ধরে নিয়েছে। এমনকি ছোট বোনটিরও তাই ধারণা। আসলে, মানুষ কত অল্প জেনে, কত অল্প বুঝে রায় দেয়। কিন্তু আমি তো জানি এই যে একটানা ক্রুদ্ধ অশান্ত গোঁ গোঁ আওয়াজ এর উৎস কোথায়। অন্তর দিয়ে জানলে অনেক জটিল বিষয়ও সরল হয়ে যায়। একবার জোর করে সরিয়ে এনে দরোজা জানালা বন্ধ করে দিয়েছিলাম। সে আমার পা কামড়ে দিয়েছিল। কাচের জিনিসপত্তর আছড়ে আছড়ে ভেঙ্গেছিল। মাছ কাটার বটি নিয়ে আমাকে তাড়া করেছিল। ভয়ংকর ভয় পেয়েছিলাম। আমি আবার খুব ভীতু কিনা। তারপরে তাকে আর কোনোদিন ঘাঁটাবার সাহস পাইনি।

দেশে অবস্থা পাল্টাচ্ছিল। আমিও পাল্টাচ্ছিলাম। স্নায়ুর প্রসারণ ঘটিয়ে অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নিতে বাধ্য হলাম। জীবনটা তো আর কোথাও ছুঁড়ে ফেলে দিতে পারিনে। অনিবার্যের সঙ্গে বিবাদ করব তেমন হিম্মত আমার কোথায়! আমি তো আর ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান নই।

আমি নিজের ভেতরেই ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাচ্ছিলাম। চার দিক থেকে সমস্ত কিছু আমার ওপর ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করছিল। কি করে মেরুদণ্ড সোজা রাখি।

আমি ভারী দুর্বল এবং ভয় কাতুরে মানুষ। গোটা যুগটাই পাগল হয়ে রেসের ঘোড়ার মতো লাফিয়ে চলছে। পরিচিত মানুষজন কাউকে একটু বিশ্বেস করতে পারতাম না। সকলেই যেন বুকের ভেতর একটা মতলব লুকিয়ে রেখেছে। যে কোনো মুহূর্তে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্যে প্রস্তুত। নিতান্ত ভয়ে ভয়ে পথে ঘাটে চলাফেরা করি। জটলা দেখলেই প্রাণটা দুরু দুরু করে। মনে হতো সমস্বরে এক্ষুনি চীৎকার দিয়ে বলবে ঐ যে দেখো আবুনসর মোক্তারের জামাই যায়। কোন আবুনসর মোক্তার চেনেন না? যে মোক্তারটি আইয়ুব খানের মস্ত একজন চেলা, যে অযোগ্য অপদার্থ জামাইকে বোবা মেয়ে গছিয়ে অফিসারের আসনে বসিয়েছে, নিরীহ ব্রাহ্মণকে ভিটেমাটি থেকে উৎখাত করে কোলকাতা পাঠিয়ে দিয়েছে। চলতে ফিরতে আমার মনে হত, এই সমস্ত ক্ষিপ্ত মানুষ যে কোন মুহূর্তে আমার শ্বশুরের তাবৎ দুষ্কর্মের ফর্দ প্রকাশ করে আমাকে ফাঁসাবে।

এটা আমার মনের একটা দিবাস্বপ্ন মাত্র। আসলে আমার মতো সামান্য মানুষ এতোগুলো মানুষের ক্ষোভ দোষের পাত্র কিছুতেই হতে পারে না। আজকাল সামান্যতেই বড় নার্ভাস হয়ে পড়ি। গ্রীষ্মের খরতাপে যেমন শীতের জমাট তুষার গলে যায়, তেমনি আইয়ুব খান সাহেবের মিলিটারি শাসনে মনে যে মেদ সৃষ্টি হয়েছিল, পাগলা যুগ তার ওপর আগুন বর্ষণ করেছিল। সেই মন গলে পুড়ে একাকার হয়ে যাচ্ছিল। আঁকড়ে ধরার মতো কোনো শক্ত খুঁটি নেই। আমার নিভৃত ঘরের বৌটিকেও মিছিলকারীদের চর বলে মনে করতে লাগলাম। স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছিলাম, তার মনের কতিপয় দাহ্য উপাদানে যুগের আগুন দাউ দাউ করে জ্বলছে। আমাকেও কেয়ার করে না।

হঠাৎ করে শহরে একটা তুলকালাম কাণ্ড হয়ে গেল। কোথায় পুলিশ নাকি আসাদ নামে কোনো একজন ছাত্রকে গুলী করে মেরেছে। তারপর দিন থেকে গোটা শহরে অলক্ষুণে ব্যাপার একের পর এক ঘটে যেতে থাকে। যে দিকেই যাই, যেদিকেই তাকাই, দেখি মানুষের মিছিল। পুলিশ আসে, ক্ষিপ্ত

মানুষের ওপর লাঠি চার্জ করে, কাঁদুনে গ্যাস ছুঁড়ে মারে। ঘর থেকে বেরিয়ে আসা মানুষ আর ঘরে ফিরে যায় না। শেষ পর্যন্ত ঘরের মানুষদের জোর করে ঘরে ঢুকিয়ে দেয়ার জন্য রাস্তায় গোমড়ামুখো বাঘমার্কা মিলিটারি নামে। রাস্তার ধারে ধারে উদ্যত সঙ্গিন হাতে জীবন্ত ল্যাম্প পোষ্টের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। সূর্যালোকে সঙ্গিনের ফলা চকচক করে। ক্ষিপ্ত মানুষ আচমকা বাধা পেয়ে থমকে দাঁড়ায়। মিলিটারিরা রাস্তা ঘাটে টহল দেয়। বুট জুতোর একটানা আওয়াজ পীচের রাস্তার বুকে গেঁথে থাকে। ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসা মানুষ আর ঘরে ফিরে না। তারা সেনাবাহিনীর বেষ্টনী ভেদ করে রাজপথ দখল করে। সৈন্যেরা রাইফেলের বেল্টে টান দেয়, ঝাঁকে ঝাঁকে গুলী বেরিয়ে আসে। মানুষের বুকে গুলী লাগে। রাজপথে লাল টাটকা খুনের প্লাবন ছুটে। রাজপথে আবার মেঘনা পদ্মার স্রোতের মতো মিছিল নামে। গর্জনে আকাশ বাতাস কাঁপে। মিলিটারি উঠে যেতে বাধ্য হয়। এই ছিল সত্যিকারের অবস্থা।

মানুষের বোকামি দেখলে আমার মতো স্বল্প বুদ্ধির মানুষের হাসি পায়। মানুষ যে কেনো মিছিল করে। কত মিছিল তো দেখলাম। জন্ম থেকেই দেখছি মানুষ হৈ চৈ করে মিছিল করছে। এতে কি লাভ! সবকিছু ওলটপালট লণ্ডভণ্ড করা ছাড়া মিছিল আর কি করতে পারে। সদরে আইয়ুব কেন যে গুলী করে মিছিল থামিয়ে দিচ্ছেন না, সেজন্য তাঁর ওপর আমার মনে মনে ভারী রাগ।

আসাদের মৃত্যুর দশবারো দিন পরেই শুরু হল ঘেরাও-পোড়াও জ্বালাও অভিযান। মিছিলকারীরা আর নিরামিষ চীৎকার কবে সন্তুষ্ট থাকতে পারছিল না। তারা ভয়ানক সহিংস একটা কিছু করার জন্যে পাগল হয়ে উঠছে। যাহোক সেদিন দেখলাম মানুষে মানুষখচিত মোটা দু'টো অজগরের মতো প্রায় স্রোতের বেগে আমাদের বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসছে। কি তীব্র গতিবেগ! সামনের সমস্ত বাধা বন্ধন চূর্ণ করে ফেলার জন্যে রেলগাড়ির মতো বেগে ছুটে আসছে। দরোজা জানালা বন্ধ করে নিশ্চিন্ত হই কেমন করে। এই ধারালো ভারালো

আওয়াজ মাতৃজঠরে প্রবেশ করে গর্ভস্থ সন্তানকেও সচকিত করে তোলে।

সেদিন তাকিয়ে দেখলাম মিছিলেরও দেখবার মতো একটি নয়ন ভুলানো সৌন্দর্য আছে। আছে তাতে গতির দোলা, ছন্দের দ্যোতনা। প্রতিটি মানুষ সমগ্র মিছিলের কাঠামোর সঙ্গে সন্নিবিষ্ট হলেও তারা সকলে আলাদা আলাদা মানুষ। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সচেতন সবাক চলিষ্ণু ঝরনা। একটি আরেকটির সঙ্গে মিশে রচনা করেছে এই গতিমান স্রোতোধারা। লক্ষ প্রাণ ঐক্যের মন্ত্রে একসঙ্গে বাধা পড়েছে। এমনি লক্ষ লক্ষ ঝরনা প্রবল প্রাণতরঙ্গে নেচে নেচে একসঙ্গে উঠছে। মনে হল মিছিল ভয়ংকর, আবার মিছিল সুন্দর। মিছিলে ধ্বনিত হয় ভাঙনের ধ্বংস নাদ, মিছিলে জাগে নবসৃষ্টির মহীয়ান সঙ্গীত। ভীষণে কোমলে কেমন আপোষ করেছে। দৃষ্টির কুয়াশা ক্রমশ কেটে যাচ্ছিল। সমস্ত বিষয় যথার্থ পরিপ্রেক্ষিতে দেখতে পাচ্ছিলাম। চোখের ওপর থেকে আরেকটা আলগা পর্দা যেন খসে পড়ল। সেদিনের মিছিল দেখে, ঠিক মনে হল মিছিলে এলে ভীরুতা কাপুরুষতা ঠিকই ভুলে থাকা যায়। একেবারে হতোদ্যম ক্ষণজীবী মানুষকেও এই মিছিল সামান্য সময়ের জন্য হলেও মহাজীবনের আস্বাদ পান করাতে পারে।

আমাদের বাড়ীর দিকে বাঁধ ভাঙা স্রোতের মতো মিছিল এগিয়ে আসছিল। রাস্তায় সমুদ্র গর্জনের মতো গম্ভীর আওয়াজ উঠছে। আওয়াজে আওয়াজে তরল লাভা স্রোতের মতো ক্ষোভ যন্ত্রণা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। মন্দ্রিত আওয়াজ নগরীর অলিতে গলিতে, অফিসে আদালতে, দোকানপাটে, মানুষের মনের রুদ্ধদ্বারে বেলা ভূমিতে সমুদ্র তরঙ্গের মতো আছড়ে পড়েছে। চারপাশে একটা নতুন উদ্দীপনা। এই সপ্রাণ মিছিল নগরবাসী মানুষের প্রাণপাতাল পর্যন্ত আলোড়িত করে তুলেছে। দেখলাম চারপাশের মানুষ মিছিলকারীদের অনুকরণ করছে।

চারদিকে একটা পরিবর্তন নিয়ে এসেছে মিছিল। তা আমার স্ত্রী মধ্যেও

একটা নতুন আঙ্গিকে দেখা দিয়েছে। আজ যেন তার খুশীর শেষ নেই। লজ্জা সঙ্কোচ, দ্বিধার অর্গল বুঝি একেবারে মনের ভেতর থেকে টুটিয়ে দিয়েছে। আমাদের বাড়ীর দিকে মিছিল আসছে। আর সে তালে তালে জিন পাওয়া মানুষের মতো লাফিয়ে লাফিয়ে উঠছে। মাথার খোঁপা খুলে গেছে। দীর্ঘ কালোচুল এলোমেলো হয়ে মুখে চিবুকে ছড়িয়ে পড়েছে। গোটা শরীরে একটা অপ্রতিরোধ্য তরঙ্গবেগ।

হেঁচকা টানে সে যেন ভেঙ্গে দুটুকরো হয়ে যাচ্ছে। পূর্ণিমা চাঁদের মায়াবী আকর্ষণে সাগরের নীল নোনা জল যেমন অপরূপ তরঙ্গভঙ্গে আকাশ অভিমুখে ধাবিত হয়, তেমনি মিছিলের দুর্বার আকর্ষণ তার সমস্ত সুকুমার প্রবৃত্তিতে একটা আলোড়ন জাগিয়ে তুলেছে। আমার মনে হল তার ভেতরে পুরনো কি একটা ধ্বসে যাচ্ছে এবং নতুন কি একটা মস্তক উত্তোলন করছে। মনে মনে শঙ্কিত হলাম। কেননা এরই মধ্যে তার গর্ভে লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছিল। শঙ্কায় হোক, মমতায় হোক স্ত্রীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এই উন্মত্ত আকর্ষণ থেকে দৃষ্টি ফেরাতে পারছিলাম না। কেমন সম্মোহিতের মতো হয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ করে উপলব্ধি আমাকে জানিয়ে দিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এই বেপরোয়া সঞ্চালনেরও একটা ছন্দ রয়েছে। তার সুন্দর পুতুলের মতো শরীরখানা ঢাকের কাঠির মত উঠানামা করছে। মাথার চুল ফেঁসো হয়ে বাতাসে উড়ছে। মাঝে মাঝে জানালার শিক ধরে হেঁচকা টান লাগাচ্ছে। এই বুঝি হুড়মুড় করে সব ভেঙ্গে পড়ল সব।

একটু অবাক হলাম। গলা দিয়ে আগে যে নুড়ি পাথরের মতো গোল গোল শব্দাংশ নির্গত হত: সেগুলো একেবারে অন্য রকম শোনাল। স্পষ্টত লক্ষ্য করলাম গোঁ গোঁ আওয়াজের ধাঁচটা খুব দ্রুত পাল্টে যাচ্ছে। গোল গোল ধ্বনিগুলো এঁকেবেঁকে তেরছা তির্যক আকার নিচ্ছে। উচ্চারণ প্রক্রিয়ার মধ্যে মাত্রার পর মাত্রা সংযোজিত হচ্ছে। শিশুর অর্থবোধক অস্পষ্ট বাক প্রয়াসের

মতো কি একটা শব্দ হয়ে বেরিয়ে আসার জন্য প্রবল সংগ্রাম করছে। আওয়াজটা গোঁ গোঁর স্থলে বা ..... বার মতো শোনাচ্ছে পরিষ্কার। প্রাণপণ শক্তিতে চেষ্টা করছে... কিন্তু বাকযন্ত্রটি কাজ করছে না।

আমি না ভেবে পারিনে, গোঁ গোঁ শব্দের এই যে গুণগত পরিবর্তন এর কারণ কি? হঠাৎ উদ্ভাবনের পুলকে চমকে উঠি। সেও মিছিলের মুখে উচ্চারিত 'বাংলাদেশ' শব্দটি ভেতর থেকে উগরে দিতে চাইছে। অক্ষম অবাধ্য কণ্ঠনালী দিয়ে উচ্চারণ করতে পারছে না। সমস্ত শক্তি জড়ো করে বাকযন্ত্রের ওপর হুকুম জারী করছে 'উচ্চারণ করো, উচ্চারণ করো'। বহুদিন পর একটানা গোঁ গোঁ শব্দের একই বুদ্ধিগ্রাহ্য অর্থ পেয়ে গেলাম।

বস্তুপুঞ্জকে আমরা যে সকল নামে ডাকি, আনন্দের বেদনার, ক্ষোভের, আশ্চর্যের যে সকল অনুভূতি বাক্যে প্রকাশ করি, ডাইনামোর আওয়াজের মতো একটানা গোঁ গোঁ শব্দের মধ্য দিয়ে সে সব প্রকাশ করে এসেছে। প্রকাশ, হায়রে প্রকাশের ব্যথা। মিছিলটা একেবারে আমাদের বাড়ির সামনে এসে পড়েছে। গোটা বাংলাদেশের শিরা উপশিরায় এক প্রসব বেদনা ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষের বুকফাটা চীৎকারে ধ্বনিত হচ্ছে নবজন্মের আকুতি। আমার বুকেও তরঙ্গ ভাঙছে। কেঁপে কেঁপে উঠছি আমি। চার পাশের সব কিছু প্রবল প্রাণাবেগে থরথর কাঁপছে। বাংলাদেশের আকাশ কাঁপছে, বাতাস কাঁপছে, নদী, সমুদ্র, পর্বত কাঁপছে। নরনারীর হৃদয় কাঁপছে। একটু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম। আচানক বোবা বৌ জানলা সমান লাফিয়ে 'বাঙলা' অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে উচ্চারণ করলো। তার মুখ দিয়ে গলগল রক্ত বেরিয়ে আসে। তারপর মেঝেয় সংজ্ঞা হারিয়ে পড়ে থাকে। ভেতরে কি একটা বোধ হয় ছিঁড়ে গেছে। আমি মেঝের ছোপ ছোপ টাটকা লালরক্তের দিকে তাকাই, অচেতন বৌটির দিকে তাকাই। মন ফুঁড়েই একটা প্রশ্ন জাগে—কোন রক্ত বেশী লাল। শহীদ আসাদের—না আমার বোবা বৌয়ের?